দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_the_SAARC.svg

ড. মোহাম্মদ আমিনুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মদ আমিনুর রহমান

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০২১

প্রচ্ছদ: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_the_SAARC.svg

অলংকরণ: আবদুল আযীয

মুল্য:

বাংলাদেশ ৩৫০ টাকা,

ভারত ২০০ রূপি,

ইউ এস ডলার ২০

South Asia and Bangladesh

Dr. Md. Aminur Rahman

First Published: July, 2021

Price:

Bangladesh Taka: 350

India: 200 Rupee

US Dollar: 20

নিবেদন, পাঠকের প্রতি

নিবন্ধগুলো দীর্ঘসময় ধরে লেখা হয়েছে যা প্রায় একটি দশককে ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এগুলোর এমন একটা সুর আছে যা সময়কে অতিক্রম করতে সক্ষম। নিবন্ধগুলো যেসব বিষয়কে ধারণ করে তার প্রায়-সার্বজনীন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে; যা ভবিষ্যতকে পথ দেখাতে পারে কিংবা বলা যায় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার পরিধি তৈরী করতে পারে। এটা অনেকটা একটা মানচিত্রের মত, যা পুরোনো হলেও একজন টুরিস্টের জন্য প্রয়োজনীয় সব সময়েই। সে অর্থে বর্তমান বইটি পাঠককে বঞ্চিত করবে না বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য সেটি কেবল লেখকের উপর নয় পাঠকের সংশ্লিস্টতার উপরও নির্ভর করে।

বইটির নামকরণে দক্ষিণ এশিয়া প্রাধান্য পেলেও মূলতঃ বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে লিখিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব পেয়েছে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক, নদীর পানি সমস্যা, সার্কের মত বিষয় তেমনি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের নারী অধিকার, আত্মহত্যা, উন্নয়ন ও বইপড়া বিষয়ক ভাবনা। আমার ধারনা, সবগুলো বিষয় পাঠককে একটা সামগ্রিক বিষয়ে আচ্ছন্ন করবে। যে বিষয়টি অতি যত্নের সাথে বিবেচনায় রাখা হয়েছে তাহলো পাঠকের অধিকার এবং সে অধিকারকে ক্ষুন্ন না হতে দেওয়া।

পরিশেষে যা কিছু অপ্রাপ্তি লেখক হিসাবে তা আমার এবং তার সকল সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে।

দক্ষিণ এশিয় ভাবনা

১. সূচীর নোবেল বক্তৃতা, আনান কমিশনের রিপোর্ট এবং রোহিংগাদের ভবিষ্যত

২. দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন ও সার্ক

৩. সার্ক উন্নয়ন ব্যাংক: আন্তঃদেশীয় উন্নয়নে বাধা দূর করবে

৪. মালদ্বীপ সার্ক সম্মেলন ও দক্ষিণ এশীয় মনস্কতা

৫. বাংলাদেশের দেশের পানি কূটনীতি ও সংকট

৬. তিস্তা কাহিনী: কি ভাবছে পশ্চিম বঙ্গ?
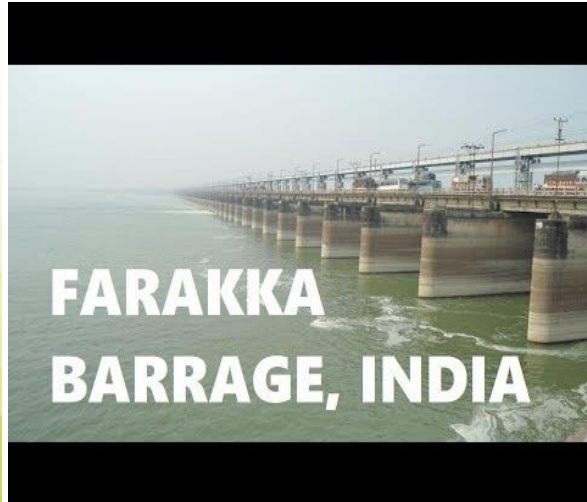
সূচীর নোবেল বক্তৃতা, আনান কমিশনের রিপোর্ট এবং রোহিংগাদের ভবিষ্যত

আমরা সম্ভবত এমন একটা সময় পার করছি যখন বিশ্ব একের পর এক জাতিগত সমস্যাসহ নানাধরণের সমস্যা অতিক্রম করে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত শতাব্দীর কসোভোর মুসলিম জাতিগত সংকট এবং ইরাকের কুর্দি সংকট। দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্থানকে কেন্দ্র করে যে তালিবান উত্থান তা ছিল ভয়ংকর; যদিও সেটা ছিল রাশিয়ার অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কৌশলের অংশ যা পশ্চিমা দেশের বিশেষ করে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সমর্থনে যা পাকিস্থানে গঠিত হয়েছিল। তবে যা মন্দের ভালো ছিল তাহলো, সেখানে কোন জাতিগত বিষয় ছিল না; বলা যায় ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ বিভক্তির পর 'ধর্ম কিংবা বর্ণ' যাই বলিনা কেন এদুটো তেমন কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি দক্ষিণ এশিয়ায় কিংবা নিকটবর্তী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। এমনকি গণতন্ত্র নিয়েও না; যদিও মায়ানমারে (তৎকালীন বার্মা) সেনা শাসন নিয়ে একটা বিতর্ক চলছিল যার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন অং সান সুচি। বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং বহুপাক্ষিক-নির্বাচন নিয়ে সুচির যে আন্দোলন, তার জন্যে তিনি ১৯৯১ সালে নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। কিন্তু মায়ানমারে অন্য যে সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে ছিল যেমন 'কারেন বিদ্রোহ' কিংবা 'রোহিংগা সমস্যা' সে সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; যা ছিল জাতিগত সমস্যা এবং ধর্মীয়-জাতিগত সমস্যা। মায়ানমারের অধিকাংশ অধিবাসির ধর্ম বৌদ্ধ হওয়াই সেখানে অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতির অভাব রয়েছে: বিশেষ করে রাখাইন রাজ্যের মুসলমানদের প্রতি, যারা বর্তমানে দলে দলে বাংলাদেশে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, রাখাইন রাজ্যের রোহিংগাদের বিরুদ্ধে 'টেক্সট-বুক-এথনিক -ক্লিনজিং'-এর; যা মানবাধিকার লংঘনের নিকৃষ্টতম ধরণ।

প্রশ্ন হতে পারে অং সান সুচি এবিষয়ে সাম্প্রতিক যে সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন, সেখানে তার করনীয় কি ছিল, যা তিনি এড়িয়ে গেছেন। কিংবা মানবাধিকার বিষয়ে তার ধারণা কি ? এক্ষেত্রে আমি অং সান সুচির নোবেল বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরা প্রাসংগিক মনে করছি :

> "....যখন আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম, আনেক বার্মিজ রিফিউজি এবং কর্মীরা আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদেরকে ভুলে যেও না', তারা বলতে চেয়েছিল, আমাদের অবস্থা ভুলে যেওনা, আমাদের সাহায্য করার কথা ভুলে যেও না; ভুলোনা আমরা তোমার জীবনের অংশ' ।......যখন নোবেল কমিটি আমাকে পুরস্কৃত করেছে তার অর্থ সেসব বিচ্ছিন্ন বার্মিজদের স্বীকৃতি দিল। ...সুতরাং আমার কাছে নোবেল

প্রাপ্তির অর্থ হলো, গণতন্ত্র এবং শান্তির প্রতি আমার নিজের দায়িত্বকে বৃদ্ধি করা; এবং শান্তিতে নোবেল প্রাপ্তি আমার হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছে............।"

সুচি তার নোবেল বক্তৃতায় বলেন, 'আমি সেইসব বন্দী, শরণার্থী, প্রবাসী শ্রমিক এবং পাচারের শিকার মানুষদের কথা ভাবি, যারা তাদের নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের থেকে এবং বাধ্য হচ্ছে তাদের সাথে বাস করতে যাদেরকে তারা পছন্দ করে না।......যদি আমাকে (সুচিকে) জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি কেন মানবাধিকার নিয়ে লড়াই করছি, তার উত্তর হলো আমি জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ সমর্থন করি'। ....যদি প্রশ্ন করা হয়, আমি কেন বার্মার গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি, তার কারণ হলো, আমি বিশ্বাস করি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠা করার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো চর্চা করার।

.... প্রকৃত লক্ষ্য হলো এমন পৃথিবী তৈরী করা যেখানে কোন বাস্তুচ্যুত, গৃহহীন,এবং হতাশায় নিমজ্জিত মানুষ থাকবেনা; এমন পৃথিবী যা হবে প্রকৃত নিরাপদ আশ্রয়স্থল যার অধিবাসিদের থাকবে স্বাধীনতা এবং শান্তিতে বাস করার অধিকার'।

এবং যখন সুচি একথা বলেন, 'Every thought, every word, and every action that adds to the positive and the wholesome is a contribution to peace. Each and every one of us is capable of making such a contribution. Let us join hands to try to create a peaceful world where we can sleep in security and wake in happiness.

একথাগুলো যে সুচির তা হয়তো এখন অনেকের ভাবতে কষ্ট হবে যদিও তিনি তা সারা বিশ্বের মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তার কর্তব্য হিসাবে। কেবল তাই নয়, তিনি সবাইকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে বলেছিলেন, যেখানে সবাই শান্তিতে ঘুমাতে এবং কাজ করতে পারবে। এর সাথে আজকের রোহিংগাদরে বাস্তবতার কতই না অমিল, যার জন্য তিনি নিজেও দায়ী বটে।

...........নোবেল কমিটি ১৪ অক্টোবর ১৯৯১-তে সুচিকে নোবেল পুরষ্কারের ঘোষনায় বলেছিলেন, "In awarding the Nobel Peace Prize to Aung San Suu Kyi, the Norwegian Nobel Committee wishes to honour this woman for her unflagging efforts and to show its support for the many people throughout the world who are striving to attain democracy, human rights and ethnic conciliation by peaceful means."

পাঠক, নিশ্চয়ই নোবেল কমিটির সেই প্রত্যাশা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে? তবে সুচি নোবেল ভাষনে যা বলেছিলেন তার সাথে তার শেষ বক্তৃতার যে অমিল তা বিশ্বব্যাপি মানুষকে আহত করেছে। এটা স্পষ্ট যে, তিনি সত্য আড়াল করেছেন এবং রাখাইন বিষয়ে সেনা-সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে; বিশ্ব অভিমত হলো, রোহিংগা সমস্যার সমাধান করার যথেষ্ট সুযোগ সুচির রয়েছে। কিন্তু মায়ানমারের একগুয়ে শাসকদের থেকে তাকে আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না। তিনি যদি আনান কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে চান তাহলে বিশ্ব জনমত যে তার পাশে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হতাশ হতে হয় যখন আমরা দেখি, সুচি নোবেল বক্তৃতায় সবাইকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে বলেছিলেন, যেখানে সবাই শান্তিতে ঘুমাতে এবং কাজ করতে পারবে, সুচি বলেছিলেন, কেউ যেন বাস্তুচ্যুত নাহয়, যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কোথাও বাস না করে। সম্ভবত: সুচি তার নোবেল বক্তৃতা ভুলে গেছেন, অথবা রোহিংগাদের যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না, হয়তো ধর্মীয় প্রতিহিংসার কিংবা অন্য কোন কারণে। যদিও তিনি আনান কমিশনের রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এ প্রসংগে আনান কমিশনের রিপোর্ট কিছুটা হলেও আলোচনা করা দরকার যেখানে সমস্যা সমাধানের জন্য পথ বাতলে দেয়া হয়েছে; যা পাঠককে বিষয়টা বুঝতে সাহায্য করবে। আনান কমিশন মায়ানমার এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কথা বলেছেন যারা রোহিংগা বিষয়ের সাথে জড়িত। এবং সব তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে কমিশন যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন তা ১২ টি থিম দ্বারা বিন্যস্ত। থিমগুলো হলো,

১. HUMANITARIAN ACCESS , ২.MEDIA ACCESS 3. JUSTICE AND RULE OF LAW 4. BORDER ISSUES AND THE BILATERAL RELATIONSHIP WITH BANGLADESH 5. SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT 6.TRAINING OF SECURITY FORCES 7. CITIZENSHIP AND FREEDOM OF MOVEMENT 8. CLOSURE OF IDP CAMPS 9. CULTURAL ISSUES 10. INTER-COMMUNAL DIALOGUE 11. REPRESENTATION AND PARTICIPATION IN PUBLIC LIFE 12. REGIONAL RELATIONS (INTERIM REPORT AND RECOMMENDATIONS : ADVISORY COMISSION OF RAKHINE STATE, MARCH, 2017)|

রিপোর্টটি অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রজ্ঞা দ্বারা লিখিত হয়েছে, এত স্বল্প পরিসরে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ সচরাচর দেখা যায়না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সেকশন আলোচনা করছি। প্রথম বিষয় 'হিউমেনিটারিয়ান এ্যাকসেস'-যেখানে বলা হয়েছে 'মায়ানমার এবং রাখাইন রাজ্য সরকার রাখাইনদের মধ্যে সকল প্রকার মানবিক সাহায্যের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করবে...এবং যারা এই সহিংসতায় আক্রান্ত তাদের কাছে পর্যাপ্ত সহযোগিতা নিশ্চিত করবে'।

দ্বিতীয় সেকশনে 'মিডিয়া এাক্সেস' নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ। এবিষয়ে আনান কমিশন যে সুপারিশ করেছে তাহলো, 'যেসব স্থানে রহিংগাদের বিরুদ্ধে বর্তমান সহিংসতা সংঘঠিত হয়েছে সেসব স্থানে অভ্যন্তরীন এবং আর্ন্তজাতিক মিডিয়াগুলোর গমণ এবং তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে'। তৃতীয় বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়েছে, 'জাস্টিস্ এবং রুল্স অফ্ ল'; সুপারিশে বলা হয়েছে, 'মায়ানমার সরকার পক্ষপাতহীন তদন্তের মাধ্যমে যারা মানবাধিকার লংঘন করেছে তাদের চিহ্নিত ও দায়ী করবে'। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তাহলো, 'বর্ডার ইস্যুজ এন্ড দ্য বাইল্যাটেরাল রিলেশনশিপ উইথ্ বাংলাদেশ'। এ সেকশনে, কমিশনের সুপারিশ হলো,'মায়ানমার সরকার অতি দ্রুত বাংলাদেশ সরকারের সাথে জয়েন্ট কমিশন গঠন করবে এবং ফেরত আসা শরনার্থীদের পূর্ণবাসন করবে। ....যখন উত্তর রাখাইন স্টেটে শরনার্থীরা ফেরত আসবে তখন মায়ানমার সরকার তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর নির্মানে সহায়তা করবে'। এবং ১২তম বিষয়ের শিরোনাম হলো, 'রেজিওনাল রিলেসন্স'; যেখানে সুপারিশ করা হয়েছে 'মায়ানমার সরকার নিয়মিত বিরতিতে যেন আশিয়ান দেশগুলোর নিকট রাখাইন রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং এজন্য বিশেষ দূত প্রেরণের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখে চলে'।

আনান কমিশনের এই প্রস্তাবনা যদি কার্যকরী করার জন্য এখন থেকেই 'মায়ানমার সরকার' আন্তরিক হয় তাহলে এই সমস্যার কার্যকরী এবং বাস্তবসম্মত সমাধান সম্ভব। কিন্তু পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে মায়ানমার সরকারের উপর কারণ এর সমাধান তাদের হাতে। বাংলাদেশ এখন যে সমস্যায় পড়লো, তা অনেকটা উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর মতো। এখন পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক মহল এমনকি জাতিসংঘ যে ভূমিকা পালন করেছে তা বেশ নজর কাড়ার মত যদিও নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব বিবেককে এবিষয়ে হতাশ করেছে। তবে বাংলাদেশের জন্য দুটি ফোরামে কথা বলার সুযোগ আছে, একটা আসিয়ান, আর একটা সার্ক। এবং অনেকদিন পর সার্কের একটা একমত হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়েছে রোহিংগা ইস্যুতে; অবশ্য যদি ভারতের মতকে পক্ষে রাখা যায়। এজন্য জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ সার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটা মিটিং আহবান করতে পারে এবং যদি

রোহিংগা বিষয়ে একটা সর্বসম্মত স্টেটমেন্ট দেওয়াতে পারে। তা নাহলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ 'রোহিংগা ইস্যুতে' একা হয়ে যেতে পারে। তাই আঞ্চলিক কূটনীতিতে বেশী জোর দিতে হবে, দূরের দেশগুলোর সাথে সাথে। মনে রাখতে হবে, রোহিংগা সমস্যা অতিদ্রুত 'দক্ষিণ এশীয়' সমস্যা হয়ে দেখা দেবে; যখন ভারত নানাভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছে। কারণ ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং সম্প্রতি 'রোহিংগা ইস্যুতে' বলেছেন, 'they are illegal migrants, not refugees'; লক্ষ্য করার মতো, বিষয়টি বাংলাদেশের মতের সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। কেবল তাই নয়,তিনি তাদের মধ্যে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের গন্ধ পাচ্ছেন, যে বৌদ্ধরা তাদের হত্যা করলো এবং করছে সেই বার্মিজদের নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি। এমনও হতে পারে, মমতা ব্যনার্জী রোহিংগাদের আশ্রয় দেওয়ার কথা বলায় বিজেপি সরকার তার রাজনৈতিক হিসেব নিকেশে ব্যস্ত আছে।

রোহিংগাদের ভবিষ্যত নিয়ে এখন এমন আশংকা করলে বোধহয় সেটা অবাস্তব হবে না, না-জানি নতুন কোন ফিলিস্তিনি সমস্যার জন্ম হতে চলেছে কিনা(?) যেখানে ইসরায়েলের ভূমিকায় দেখা যাবে 'মায়ানমারকে' আর ফিলিস্থিনির ভূমিকায় 'রোহিংগাদের'; পার্থক্য আঞ্চলিক বিন্যাসে, একটা মধ্য এশিয়ায় আর একটা দক্ষিণ এশিয়ায়; আর নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হলো 'ধর্মে মুসলমান'; নির্যাতনকারী ওখানে 'ইহুদী আর এখানে বৌদ্ধ'।

শেষ করবো বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি উক্তি দিয়ে, ' 'The barking dog seldom bite......একথা আমিও জানি, তুমিও জানো; বিলক্ষণ ওই কুকুরটি জানে না..; অতএব পথিক সাবধান'! মনে হয় রোহিংগা ইস্যুতে মায়ানমার সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর এই পর্যবেক্ষণ সত্য হতে চলেছে?

দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন ও সার্ক

১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যে আবেগ, যুক্তি ও স্বপ্ন নিয়ে, তা পুরো দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মধ্যে একটি আকাঙক্ষার জন্ম দিয়েছিল। আর তা হলো- দরিদ্র ও সামাজিক অসাম্যমুক্ত একটি আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার বিকাশ; যেখানে সীমানা থাকলেও মানুষের মনে কোনো সীমানা কিংবা বিভেদ রেখা থাকবে না। আমাদের পরিচয় হবে, 'আমরা দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিক'। রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের পরিমন্ডলে এটি হবে নবতর সংযোজন। আর এ আকাঙক্ষার পেছনে কাজ করছে আমাদের হাজার বছরের পরিচয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা একদিন একই আবাসে একসঙ্গে জীবন যাপন করেছিল, জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে উদ্ভাবন করেছিল নব নব উৎপাদন পদ্ধতি, আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে সমভাবনা, জীবনযাপন রীতি। তাই দেখা যায়, খাজুরাহো, মহেঞ্জোদারো আর পাহাড়পুর একই ভৌগোলিক সীমারেখায় একই মানবগোষ্ঠী দ্বারা তৈরী হয়েছে। সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদান অবশ্যই অপরিমেয়। সমভাবনার ভিত্তিভুমির ওপর দাঁড়িয়ে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' যা করতে পেরেছে, আমরা কি সার্কের লক্ষ্য বাস্তবায়নে তা করতে পারব। এখন পর্যন্ত একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে সার্কের অর্জন কতিপয় উইং স্থাপন ও চুক্তি করা। তবে কখনো কখনো এটি গতির সঙ্গে কাজ করেছে। সংস্থাটির সবচেয়ে বড় অর্জন সার্কের সদর দপ্তর স্থাপন এবং মহাসচিব পদের সৃষ্টি। এনার্জি চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের মধ্যে তা কিছুটা হলেও কার্যকরী হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে তড়িৎ-জ্বালানি কিনবে। ট্রেড-লিবারেলাইজেশনের জন্য যে ট্যারিফ হ্রাস করা দরকার, পোর্টে যেসব যান্ত্রিক সুবিধা দরকার, সেক্ষেত্রে অর্জন অতি নগণ্য। তবে ইদানীং সন্ত্রাসবাদ দমনে টাস্কফোর্স গঠনে সব সদস্যই একমত হয়েছে। সার্ক অ্যান্টি-টেরোরিজম টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। এছাড়া সার্ক ব্রডকাষ্টিং সেন্টার ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।

তবে এরই মধ্যে আরো যা করা দরকার ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, দক্ষিণ এশীয়মনস্ক নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন মডেলে 'সার্ক পার্লামেন্ট' গঠনের মতো বিষয় এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায় না। এমনকি আমরা পারিনি সব মানুষের জন্য সার্ক ভিসা চালু করতে। একটি সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। তবে তার পঠনরীতি কতটা দক্ষিণ এশীয়মনস্ক নাগরিক কিংবা যুব সম্প্রদায় তৈরিতে সক্ষম, তা তেমন স্পষ্ট নয়। আর 'ইউরোর' মতো সার্কমুদ্রা চালু করা, তা আদৌ হতে কিনা, সেটি তো আমার মতো অতি স্বাপ্নিকের পক্ষেও বলা সম্ভব নয়। সার্ক নামক প্রতিষ্ঠানটির বিকাশের পক্ষে বড় বাধা হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। এর বড় ধাক্কা হলো ইসলামাবাদ সার্ক সামিট, ২০১৬ স্থগিত

হওয়া। এটি সাম্প্রতিক অতীতে সার্কের জন্য বড় ব্যর্থতা। তাছাড়া আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখতে ভারতের মনোভাব সার্কের পরিপন্থী। কারণ ভারত সব সমস্যার সমাধান দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে করতে চায়। যেমন- কাশ্মীর সমস্যা সমাধান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পানির হিস্যার বিষয়। এসব বিষয় সার্ক সামিটে আলোচনা হোক, ভারত তা চায় না। ইদানিং সার্কে চীনের পর্যবেক্ষকের মর্যাদার বিষয়টিও ভারত বিরোধিতা করেছে, মূলত তার 'বিগ-ব্রাদার' মনোভাব কার্যকর রাখার জন্য। আর এসবই সম্ভাবনাময় সার্কেও বিকাশের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

এত কিছুর পরও একটি কার্যকরী সংস্থা হিসেবে সার্ক বিকশিত হবে- এ প্রত্যাশা সবার; যেখানে আরো উন্নয়ন, পিপল-টু-পিপল যোগাযোগ, শিক্ষা ও মানবসম্পদের বিকাশ এবং এ অঞ্চলে দক্ষিণ এশীয় নাগরিক হিসেবে সব মানুষ এক নতুন সম্ভাবনার মধ্যে যুক্ত হবে। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষের আবাদভুমি, যেখানে ৪০ শতাংশ মানুষ দৈনিক রোজগার করে ১ দশমিক ২৫ মার্কিন ডলারের নিচে। এই বিপুল জনগোষ্ঠী এবং সম্ভাবনা; উভয়েরই রয়েছে গুরুত্ব। তাই গভীরভাবে ভাবতে হবে সার্কের বিকাশ নিয়ে, যা সারা বিশ্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নত হলে তার প্রভাব পড়বে সারা বিশ্বে, এখানে সমঝোতা ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হলে তার প্রভাব পড়বে অন্য অঞ্চলে। আমরা চাই, আন্তঃরাষ্ট্রীয় কোন্দল থেকে বেরিয়ে সার্ক প্রকৃতই বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক, এ অঞ্চলের মানুষ 'দক্ষিণ এশীয় নাগরিক' হিসেবে নিজেকে বিশ্বমাঝে পরিচিত করুক।

[দৈনিক বণিক বার্তা, তারিখঃ ৩০/১২/২০১৬ইং]

সার্ক উন্নয়ন ব্যাংক: আন্তঃদেশীয় উন্নয়নে বাধা দূর করবে

শুরু করতে চাই অমর্ত্য সেনের একটি লেখা দিয়ে। তার 'ভারত উন্নয়ন ও বঞ্চনা' গ্রন্থে বলেছেন, 'উন্নয়ন মানে কেবল জিডিপির বৃদ্ধি নয়, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নতি বা সামাজিক প্রগতির মতো কিছু পরিবর্তন দিয়েও তাকে সম্যকভাবে ধরা যাবে না। শেষ বিচারে, মানুষ যে ধরনের জীবনযাত্রাকে যথার্থ মূল্য দেয়, তেমন জীবনযাপনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার প্রসারই হলো প্রকৃত উন্নয়ন। হয়তো মতে হতে পারে, শিরোনামের সঙ্গে এর যোগাযোগ কী? সত্যিই একটা যোগাযোগ রয়েছে, সার্কভুক্ত দেশগুলোয় যদি মিষ্টার সেনের ভাষায়, 'শেষ বিচারে, মানুষ যে ধরনের জীবনযাত্রাকে যথার্থ মূল্য দেয়, তেমন জীবনযাপনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার প্রসারই হলো প্রকৃত উন্নয়ন' - তা-ই করতে চাই; তাহলে অর্থ এবং পরিকল্পনা দুই-ই প্রয়োজন।

যেকোনো উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলোর মধ্যে 'অর্থ হচ্ছে অন্যতম। এ নিয়ে নানামুখী বিতর্ক থাকতে পারে, তবে অর্থ ছাড়া কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। বলা যায়, মানবসম্পদ এবং সাংগঠনিক দক্ষতাও উন্নয়নের জন্য বিকল্পহীন নিয়ামক। তবে ভুললে চলবে না, এসবের জন্যও অর্থ প্রয়োজন। আধুনিকতার বড় ব্যর্থতা হচ্ছে, তা অতি মাত্রায় অর্থের ওপর নির্ভরশীলতা। 'দরিদ্রতা থেকে মুক্তি এবং উন্নত জীবনযাপন' বিষয় দুটি বর্তমানে ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে মুখ্য বিষয়। আর এসব থেকে মুক্তির জন্যই নানা ধরনের উদ্ভাবনী লক্ষ করা যায়; যেমন আঞ্চলিক সহযোগিত। কোনো রাষ্ট্র এখন আর এককভাবে এসব সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে না; সে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক ফোরাম, যেমন- ইইউ ও সার্ক। আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় সার্ক এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

শুরুতে সাতটি দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত হলেও বর্তমানে তার মোট সদস্য আটটি দেশ; এবং বলা যায়, সমসাংস্কৃতিক এবং ভৌগলিক ঐতিহ্যের পরিচয়কে ভিত্তি করে এর গঠন। প্রায় চার দশক এর বয়স, তবে সে তুলনায় তার অর্জন প্রশ্নসাপেক্ষ। একক আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠন হিসেবে সার্ক একনো যা করতে পারেনি কিন্তু করা জরুরি ছিল, তার মধ্যে রয়েছে 'একক মুদ্রা এবং সার্ক ব্যাংক ও সার্ক পার্লামেন্ট' প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু মন্দের ভালো, এরই মধ্যে সার্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। বছর দুয়েক আছে, ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সার্ক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, দক্ষিণ এশিয়ার টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাংক এবং এডিবির ঋণ শর্তের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে সার্ক গ্রুপ অব এমিনেন্ট পারসন্স (জিইপি) কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবনায়, যা ১৯৯৮ সালে পেশ

করা হয়। এর নাম প্রস্তাবনা ছিল 'ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ফর সাউথ এশিয়া'। এখন বলা যায়, বিষয়টি আলোচনার টেবিলে এসেছে; যদিও বেশ দেরিতে।

বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যায় যখন দেখি, বিশ্বব্যাংক ২০১৪ সালে তার প্রণীত রিপোর্ট 'রেডিউসিং পোভার্টি বাই ক্লোজিং সাউথ এশিয়ানস ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্যাপ'-এ বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় ৩৫০ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের ঘাটতি রয়েছে আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, যা ব্যয় করা দরকার যোগাযোগ (এক-তৃতীয়াংশ), বিদ্যুৎ (এক-তৃতীয়াংশ) এবং অন্যান্য খাতে (পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট, টেলিকমিউনিকেশন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে)। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়নের জন্য। আর এ অর্থ আমাদের কাছে নেই; যার জন্য হয়তো আবার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের কাছে ধরনা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের হাতে যে বিকল্প রয়েছে, সেটির দিকে সার্কের কর্তাব্যক্তিদের এখনই নজর দেয়া দরকার; তাহলো সাকৃ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

বিষয়টি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। দক্ষিণ এশিয়ায় যেখানে পুরো পৃথিবীর প্রায় ২৪ ভাগ লোক বসবাস করে, তাদের ভাগ্য প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে সার্কের সফল বিকাশের সঙ্গে। তার জন্য দরকার নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে আন্তঃসার্ক সহযোগিতা ও উন্নয়ন হবে বাধামুক্ত। তাছাড়া আর্থিক-কূটনীতির মাধ্যমে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বড্ড বেশি শোষিত হয় নানামুখী শর্তের মাধ্যমে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এমনকি 'সার্ক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হলে এ দেশগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়, প্রাথমিক তহবিল ধরা হয় ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা ব্যয় করা হবে দক্ষিণ এশিয়ার এনার্জি, যোগাযোগ, টেলিকমিউনিকেশন ও পরিবেশ উন্নয়নে।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন সার্ক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রয়োজন? এক্ষেত্রে আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংকের শরণাপন্ন হতে হয়, তার সেন্টার-পেরিফেরি তত্ত্বে কীভাবে এসব পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ) তৃতীয় বিশ্ব থেকে উদ্বৃত্ত প্রথম বিশ্বে পাচার করে, তা বিশ্লেষণ করেছেন। এবং এটা প্রমাণিত, এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ 'নাটের গুরুর' ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর ঋণ নিয়ে বিশ্বব্যাংক যা করেছে, তা এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ (তবে আমরা আশির দশকের পিএল-৪৮০-এর কথা এখনো ভুলতে পারিনি)। তার বিপরীতে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে জবাব দিয়েছে, সেটা অন্তত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর, এমনকি সার্কভুক্ত দেশগুলোর কাছেও নজির হয়ে থাকবে। যাকে কবি সুকান্তের ভাষায় বলা যায়,

‘পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়; জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়’। নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশ মাথা নোয়ায়নি। আর এখানেই নিহিত রয়েছে নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। মাথা যদি না নোয়াতে চাই, তাহলে নিজস্ব ব্যাংক প্রয়োজন, যা আমাদের মর্যাদাশীল করবে। এটা সত্য, এরই মধ্যে ব্রিকস ব্যাংক একটা উদাহরণ তৈরি করেছে, কিছুটা স্বপ্নও বৈকি; যা বিশ্বব্যাংককে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছে। অতি অবশ্যই আর্থিক কূটনীতির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য যে বিশাল অংকের মূলধন সার্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন, সেটাই বড় ব্যালেঞ্জ। নানা বিকল্প আমাদের হাতে আছে, এর জন্য ব্যাংকের শেয়ার আগেই বাজারে ছাড়া যেতে পারে, যাতে করে ন্যূনতম অর্থ জোগাড় করা সম্ভব হয়; ইচ্ছা করলে দক্ষিন এশীয় শিল্পপতিরা এগিয়ে আসতে পারেন।

আমরা চাই আমাদের এ অঞ্চলের দেশগুলো থেকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠান দ্রুত বিদায় নিক; কিন্তু তার আগে প্রয়োজন সার্ক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা, যা আমাদের এর অঞ্চলের মানুষকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখাবে, যা ২০০ কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে; আমরা আমাদের মুনাফা এসব দেশের মধ্যেই মানবকল্যাণে ব্যয় করতে চাই। পৃথিবীর সবদেশের জন্য মানবসম্পদের মূল ভান্ডার দক্ষিণ এশিয়া ও চীন। তাই সটিক পরিকল্পনায় মানবসম্পদ গঠন করতে পারলে পুরো পৃথিবীর অর্থনীতির সিংহভাগ দক্ষিণ এশিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এখন প্রয়োজন সব দ্বিধা ভুলে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে ন্যূনতম মতৈক্যের ভিত্তিতে দ্রুতই ‘সার্ক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’-এর প্রাথমিক অনুমোদন এবং একক মুদ্রার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সার্ক মুদ্রা নিশ্চিয়ই ডলারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে এবং ডলার ক্রয়ে যে বিপুল অর্থ গচ্চা দিতে হয়, যা আমাদের দরিদ্রতারও কারণ বটে, সেখানে দর কষাকষি করতে পারবে। ইউরোর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য সফল অভিজ্ঞতা হতে পারে। আমরা দক্ষিন এশিয়ার নাগরিক হতে যেমন আগ্রহী, তেমনি বিশ্ব মাঝে আমাদের সাংস্কৃতিক আলো ছড়িয়ে দিতে চাই। যেটি শুরু হয়েছিল প্রথমবার সার্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে; তেমনি দ্বিতীয়বার তা কার্যকরী হবে ‘অর্থনীতি-কূটনীতি’ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। একজন বাংলাদেশী এবং সার্ক নাগরিক হিসেবে এ স্বপ্ন দেখা নিশ্চিয়ই অতি স্বপ্ন নয়।

আমি আলোচনাটি শেষ করব অমর্ত্য সেনের একটি স্বগোক্তি দিয়ে, যেখানে তিনি বলেছেন, ‘আমি সারা জীবন ক্ষমতাসীনদের উপদেশ দেয়া থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছি। কখনো কোনো সরকারকে আমি মন্ত্রণা দিইনি। আমার বক্তব্য জনসাধারণের দরবারে আলোচনার জন্য রেখেছি’। উপরোক্ত যুক্তিগুলো যদি পাঠকের মনে কৌতুহল সঞ্চার করে থাকে, তবে আরো বিস্তারিতভাবে এগুলো আলোচনা করা যাবে।

[দৈনিক বণিক বার্তা, তারিখ: ১৭/০৩/২০১৭ইং]

মালদ্বীপ সার্ক সম্মেলন ও দক্ষিণ এশীয় মনস্কতা

অনেকদিন থেকেই সার্ক এক ধরণের নির্লিপ্ত সচেতন মহলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কাঠামো হিসেবে এর কার্যকারিতা এমনকি ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। মনে হয়েছিল যে স্বপ্ন নিয়ে এর যাত্রা তার হয়ত মৃত্যুই হতে চলেছে অথবা হয়ত সার্ক একটা কাগুজে প্রাণী হবে, যা গর্জন করলেও কোনো কিছুই বর্ষণ করতে পারবে না। অন্তত সে ধারণা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে 'মালদ্বীপ আদ্দু সার্ক সম্মেলন'।

এবারের সার্ক সম্মেলন 'সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশার কাছাকাছি যেতে পেরেছে। যেখানে একটি 'কাঠামো' হিসেবে সার্কের যে চরিত্র পাওয়া দরকার সেদিকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রথম যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহল সম্মেলনের টাইটেল- থিম, 'Building Bridges'। দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হওয়া দরকার, প্রয়োজন 'সম-মন এবং সম-স্বার্থ' তৈরি হওয়া যাকে আমরা 'দক্ষিণ এশীয় মনস্কতা' বলত পারি; যা বেশ জটিলও বৈকি। তবু কৌশল অবলম্বন করতে হবে এ ধরনের আঞ্চলিক মনস্কতা তৈরির জন্য; যা ফুটে উঠেছে থিম সিলেকশনে। দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মধ্যে যত বেশি যোগাযোগ তৈরি হবে ততটাই সমসম্পর্ক তৈরি হবে, অবসান হবে ভুল বুঝাবুঝির। সীমানা থাকলেও মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কই 'সীমানাবতির্ভুত' এক সম্পর্কের বাঁধন তৈরি করবে যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেবে আর নেবে' মিলিবে মিলাবে' হবে কার্যকর। আমাদের সামনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবে বর্তমান।

এবারের সম্মেলনে মোট একুশটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিষয়টি বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো এখানে দেয়া হল:

দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের মাঝে কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া। আঞ্চলিক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে নতুন প্রস্তাবনা তৈরি করা।

আঞ্চলিক রেলওয়ে চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেই সঙ্গে দ্রুত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-নেপালের মধ্যে 'কনটেইনার ট্রেন' চালু করার ব্যবস্থা নেয়া।

ভারত মহাসাগরে কার্গো ও প্যাসেঞ্জার ফেরি ও কার্গো চালুর জন্য সেক্রেটারি জেনারেলকে প্রস্তুতিমুলক কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। এর জন্য ২০১১ সালে ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ করতে বলা হয়েছে।

জলবায়ু বিষয়ে ‘থিম্পু ঘোষণা’ বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে। ‘আঞ্চলিক শক্তি বিনিময় ও সার্ক ইলেকট্রিসিটি মার্কেট’ এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ‘ইন্টার গভর্নমেন্টাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর এনার্জি কোঅপারেশন’ গঠন করা হয়েছে। ‘সার্ক ফুড ব্যাংক’ যাতে কার্যকরী হতে পারে তার জন্য মন্ত্রীপর্যায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। ‘সন্ত্রাসবাদ নির্মুল করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কনভেনশনসহ সার্ক কনভেন কার্যকরী করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে এমডিজি ও এসডিজি কার্যকরী করা যায়। নারী পাচার প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমান কনভেনশনের আরও উন্নীতকরণ যাতে ‘পতিতা’ হিসেবে পাচারকৃত নারীর ব্যবহার বন্ধ করা যায়; আগামী সামিটে যেন গৃহীত হতে পারে। সবদেশের শিক্ষাগত ডিগ্রিকে সমমর্যাদা প্রদান করার জন্য দেশগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং থিংক-ট্যাংদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপন করা। ‘সাউথ এশিয় ফোরাম’ কার্যকরী করা। সার্ক সেক্রেটারিয়েট ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকরী করা। ২০১২ সালের আগামী সম্মেলনের আগেই সার্কের ‘অবজারভারদের’ সম্পর্ক কি হবে, নির্ধারণ করা। ‘সার্ক মিডিয়া ডে’ নির্ধারণের জন্য আঞ্চলিক মিডিয়া সম্মেলন করা। (তথ্য সূত্র : ওয়েবসাইট, ‘মালদ্বীপ সার্ক সম্মেলন’)।
বর্ণিত বিষয়গুলোর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব এবারের সম্মেলন এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে যা কার্যকরী হতে আমরা এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন দেখতে পারব। একাধিক দেশের মানুষের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যোগাযোগ।

খুব প্রাথমিকভাবে হলেও বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপালের মধ্যে কনটেইনার ট্রেন চালু করার উদ্যোগ যথেষ্ট ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে এবং এসব দেশের মধ্যে পণ্যে আদান প্রদান হবে নতুন দিগন্তের সূচনা। তাই নয়, সাধারণ মানুষ এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ‘সার্ক ট্রেন’ চালুর সুবিধা বুঝতে পারবে। ভারত মহাসাগরে নতুন কার্গো ও প্যাসেঞ্জার ফেরি চালু করার জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা যদি দ্রুত কার্যকরী করা যায় তাহলে আঞ্চলিক ফোরাম হিসেবে সার্ক বিশ্বদরবারে নিজের যোগ্যতা প্রমাণে একধাপ এগিয়ে যাবে। সার্ক অঞ্চলে ‘কমন ইলেকট্রিসিটি গ্রিড’ তৈরী খুব জরুরি। তার জন্য এবার নেয়া হয়েছে নতুন সিদ্ধান্ত, যা এসব দেশের উন্নয়নে অভূতপূর্ব ভুমিকা রাখবে; বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় করবে সহায়তা। টেকসই উন্নয়নের জন্য এর বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি সম্ভাবনাময় আগামীর স্বপ্ন দেখাতে হয় তাহলে এসবের বাস্তবায়ন এখনই জরুরি। এছাড়া ‘সার্ক ফুড ব্যাংক’-এর যে প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্য-অধিকার নিশ্চিতকরণে এ অঞ্চলের মানুষদের নতুনভাবে সাহস জোগাবে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পাচার প্রতিরোধ বিষয়গুলোতে নেয়া সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হলে এ অঞ্চলে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস পাবে আর বৃদ্ধি পাবে নারীর

মর্যাদা। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে একটা বড় সমস্যা হল, 'শিক্ষা-ডিগ্রি'-তে সমতার অভাব; যা এক দেশের শিক্ষিত নাগরিকের অন্য দেশে কাজের জন্য বাধা। এক্ষেত্রে নতুন সিদ্ধান্দ হল সবদেশের শিক্ষা সনদ যাতে সমমর্যাদার হয় তার জন্য সব দেশের শিক্ষা আইন পরিবর্তনসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ বিষয়টি খুবই জরুরি কারণ 'সার্ক সিটিজেনশিপ' কার্যকরী করতে হলে এটা যত তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা যায় ততই মঙ্গল। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে মিডিয়া সম্প্রচার নিয়ে বেশ জটিলতা রয়েছে। যেমন ভারতে বাংলাদেশের কোনো টিভি চ্যানেল সম্প্রচার করা হয় না। এক্ষেত্রে রয়েছে দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতার অভাব। এসব বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন করতে 'সার্ক মিডিয়া-ডে' পালনের জন্য আঞ্চলিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। হয়ত এর মাধ্যমে আমরা এমন তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারব, যা আমাদের দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে ভুমিকা রাখবে।

এসবই আমাদের বর্তমান সার্ক সম্মেলনের প্রাপ্তি। আমরা আশা করি, এ সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হলে আমরা এমন এক দক্ষিণ এশিয়া পাব যেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে পারবে; পৃথিবীর সব থেকে দারিদ্র্যপীড়িত, অধিক জনসংখ্যার অঞ্চল 'দক্ষিণ এশিয়া'; সম্মিলিত শক্তি দ্বারাই সম্ভব সব সমস্যার সমাধান করা। নতুন স্বপ্নের বাস্তবায়নে সার্ক ভুমিকা রাখবে, আমরা হব 'দক্ষিণ এশীয় নাগরিক', মাথা তুলে দাড়াবো পৃথিবীর বুকে সে প্রত্যাশায় রইলাম। জয় হোক 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা'।

[দৈনিক ডেসটিনি, তারিখঃ ২৩/১১/২০১১ইং]

বাংলাদেশের দেশের পানি কূটনীতি ও সংকট

বাংলাদেশ ভারত পানি সমস্যা নিয়ে গত দুই বছর ধরে একটি একাডেমিক গবেষণায় নিয়োজিত থাকার সুবাদে এবিষয়ক যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত দেখা ও জানার সুযোগ হয়েছে। দেখার সুযোগ হয়েছে এ অঞ্চলের সব কটি পানি চুক্তিও। এবিষয়ক ভারতের পানি কুটনীতি, চীনের পানি-ভাবনা এমনকি পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর পানি ভাগাভাগি মডেল, নেপালের মহাকালী নদীর পানি ভাগাভাগি চুক্তি বিশেষণের সুযোগ হয়েছে। যেটি আমি এখনও বুঝতে পারিনি তাহলো 'আমার নিজের দেশের পানি কুটনীতি কী? কোন স্বাধীন দেশ তার সমস্যা সঙ্কুল বিষয়গুলো নিয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি স্পষ্ট অবস্থান নেবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য ভারতের সঙ্গে ক্রম সম্প্রসারিত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিয়ে আমরা এমন কোনো 'মডেল কিংবা কাঠামোগত হিসাব' ভারতের কাছে কিংবা বিশ্ব দরবারে পেশ করতে পারিনি, যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে নদীর পানির হিস্যার ক্ষেত্রে তার কুটনীতির ওপর নির্ভর করতে পারে। সব সমস্যার সমাধান করতে হবে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে; এর বাইরে কিছুই বলা যাবে না। যদি সে বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের লজ্ঘনও হয়(?) তবুও। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির বাইরে কিছুই করা যাবে না; যদিও গত চল্লিশ বছরে কত জল যে কোথায় গড়িয়েছে তার হিসাব কারও কাছে নেই। তার ওপর আছে গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া। আমাদের বর্তমান ও অতীত সরকারগুলো ভারতের সঙ্গে কি চুক্তি করে থাকে তা সাধারণ জনগণ তো পড়ে মরুক পার্লামেন্টই জানে না। এবারো কি চুক্তি হলো ভারত বাংলাদেশের মধ্যে জনগণ স্পষ্ট কিছুই জানে না। আমরা যা জানি, তিস্তা-চুক্তি ভেস্তে গেল, আর এখন দেখতে পাচ্ছি টিপাইমুখে ভারত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ড্যাম নির্মাণের সব আয়োজনই শেষ করেছে।

তার ওপর আছে ভারতের 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প'। ২০০২ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে ২০১৬ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হবে। এটি ভারতের ইতিহাসের সব থেকে ব্যয়বহুল প্রকল্প; যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৬০০ বিলিয়ন রুপি। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ কেবল মরুভুমি নয়, পরিত্যক্ত অঞ্চলে পরিণত হবে। এ প্রস্তাব প্রথম পেশ করে স্যার আর্থার কটন ১৮৩৯ সালে। তারপর সে ধারনা নীরবে নির্ভৃতে চর্চিত হতে থাকে; কিন্তু হঠাৎ ২০০২ সালে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সে প্রস্তাব এপিজে আবুল কালাম উত্থাপন করলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাস্তবায়নের; কিন্তু তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির কোনো ভালো-মন্দ চিন্তা করেনি। এমনকি আন্তর্জাতিক নদী আইন ও ভারত আমলে নেয়নি। প্রশ্ন হলো, সে ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি? বাংলাদেশ কি তখন কিংবা এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ করেছে। আমরা কেবল আছি

ফারাক্কা কিংবা তিস্তা অথবা টিপাইমুখ নিয়ে; কিন্তু ভারত যদি আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তাহলে এমনিতেই বর্তমান নদীর পানির সমস্যা নিয়ে আলোচনার আর প্রয়োজন হবে না। এখানেও বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে ভারতের 'বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে, আন্তর্জাতিক নদী আইনের কথা বলতে। আমরা কি তখন চীনকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছিলাম? সেই একই সমস্যা কিসের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবাদ করবে(?) পানি কূটনীতিবিষয়ক কোনো মডেলই তার নেই।

মাঝে মাঝে আমাদেও 'না জানার' কারণে বিভ্রান্তিমুলক তথ্যও বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে। যেমন আজকাল প্রায়শই পাকিস্তান-ভারত যেভাবে সিন্ধুর পানি ভাগাভাগি করেছে সে মডেল অনুসরণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যেটি জানে না তাহলো, সিন্ধু নদীর জল বন্টন ব্যবস্থায় মধ্যস্থতা করেছিল 'বিশ্ব ব্যাংক'। অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষ; কিন্তু বর্তমানে ভারত কোনো ক্রমেই তৃতীয় কারও উপস্থিতি মানতে রাজি নয়। আর তখন সে চুক্তিতে ভারত সই করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ বিশ্ব ব্যাংক ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিল। পরে বিশ্ব ব্যাংকও তার 'নেগোসিয়েশন স্ট্র্যাটেজি' পরিবর্তন করেছে।

এখন যে বিষয়টি দেখা দরকার তাহলো 'জয়েন্ট রিভার কমিশন' এ্যাপ্রোচ দু'দেশের পানি সমস্যার সমাধানে কতটা সফল? পৃথিবীর কতটা দেশ আমাদের এ মডেল অনুসরণ করে থাকে? কোন অভিজ্ঞতা ছাড়া বলা যায়, বিগত চল্লিশ বছরে কেবল মাত্র বৈঠক করা ছাড়া 'তেমন বলার মতো' কিছুই আমরা এ পদ্ধতিতে লাভ করতে পারিনি। তাছাড়া আছে অন্য সমস্যা, গঙ্গার জন্য ফারাক্কা চুক্তি, তিস্তার জন্য আর এক চুক্তি, বরাক (টিপাই)-এর জন্য আর এক চুক্তি; এসব কি আদৌ সম্ভব? পঞ্চাশের অধিক নদী আছে এ দুই দেশের মধ্যে; তাহলে কতটা চুক্তি করা সম্ভব? নাকি এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা বেসিনের পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বহুদেশীয় কমিশন গঠন করা উচিত। পূর্ব এশিয়াতে 'মেকং রিভার কমিশন' যেভাবে কাজ করে থাকে এখানে সে মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। তা হতে পারে 'গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা বেসিন পানি ব্যবস্থাপনা কমিশন'।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমাদেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নদীর পানি বিষয়ে কণ্ঠস্বর এতই ম্রিয়মাণ যা অন্য দেশ কেন খোদ ভারতই শুনতে পায় না। হ্যাঁ, এটা ঠিক এখন ভারতকে এই প্রস্তাবটি দেওয়া দরকার কারণ চীন ব্রহ্মপুত্রের ওপর যে ড্যাম তৈরি করছে তাতে ভারত বাংলাদেশকে 'পানি কুটনীতির ক্ষেত্রে' কাছে পেতে চাইবে। পরের জন্য গর্ত করলে কেমন লাগে ভারত এখন কিছুটা হলেও বুঝতে পারছে। তবে মনে রাখতে হবে, চীনের 'জিও-পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজি'তে ভারতই তার ঐতিহাসিক শত্রু। তারপর ইদানীং বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে মৈত্রের নামে যে মাখামাখি করছে বিশেষ করে সেভেন সিস্টার-এ ট্রানজিট সুবিধা দেওয়াতে

নিশ্চয়ই চীন খুশি নয়। এমনকি ভারত মহাসাগরে চীনের নৌবহর এবং দুরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি এসবও ভারতের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এখন বাংলাদেশকে সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে। শেষ করবো অস্ট্রেলিয়ান গবেষক, ম্যাক গ্রিগরের একটি উক্তি দিয়ে, 'বাংলাদেশ নদীর পানি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগেই পরাজিত হয়; যদিও তারই পানি পাওয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। কারণ কূটনৈতিক দক্ষতার অভাব। আশা করি এ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হবে।

[দৈনিক ডেসটিনি, তারিখ: ১৩/০১/২০১২ইং]

তিস্তা কাহিনী: কি ভাবছে পশ্চিমবঙ্গ

'রাজা যায় রাজা আসে... কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না' - ভারতবর্ষ নিয়ে মন্তব্যটি করেছিলেন ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ের ।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সফর অনেকটা রাজায়-রাজায় বন্ধুত্বের প্রতিফলনের মতো যেখানে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের তেমন কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অন্তত সব বিশ্লেষণের নির্যাস এটুকু। প্রাপ্তি অনেকটা যেন দূর থেকে দেখা জাহাজের মাস্তুলের মতো, যেখানে জাহাজটা ঠিক চোখে পড়ে না। তবে এ বিশ্লেষণ বাংলাদেশনির্ভর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর ভাবনা কি? বিশেষ করে তিস্তার পানিবন্টন চুক্তি না করতে পারা নিয়ে যে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ কি ভাবছে? মূলত এ নিবন্ধে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। কারণ মমতা ব্যানার্জি এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অনুভূতিকে বাদ দিয়ে এ চুক্তি যে সম্ভব নয় তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১১-তে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা শিরোনাম করেছে- 'রাজ্যের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে অনড় থেকে মোক্ষম চাল মুখ্যমন্ত্রীর। সংবাদটিতে বলা হয়েছে, '... তার (মমতার) আপত্তিতেই শেষ মুহূর্তে আটকে গেছে বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা পানিবন্টন চুক্তি। এবং এর ফলে রাজ্যের স্বার্থে একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। ... রাজ্যের স্বার্থে রুখে দাঁড়িয়ে তিনি চুক্তি আটকে দিয়েছেন। ... এবং যে চুক্তি রাজ্যের স্বার্থে আঘাত করে তিনি তার বিরোধিতা করবেনই। ... বরং মমতা আপত্তি তুলে চুক্তি স্থগিত করাতে পেরে এটাই দেখানোর সুযোগ পেলেন যে, রাজ্যবাসীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করারও যোগ্য ব্যক্তি তিনি'।

বিগত বাম-জমানার সেচমন্ত্রী সুভাষ লস্কর জানিয়েছে- 'এ রাজ্যের প্রজেক্ট-কম্যান্ড এরিয়ার ২৫ ভাগের বেশি জল বাংলাদেশকে দিতে তাদের (বাম) সরকারের আপত্তি ছিল'। পত্রিকাটি প্রশ্ন তুলেছে, মমতাকে তিস্তা চুক্তির খসড়া দেখানো হয়নি কেন? এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্য সরকারের আপত্তি থাকলে কোনো চুক্তি করা যাবে না'। তবে মমতা শুষ্ক মৌসুমে ২৫ হাজার কিউসেক হারে পানি দিতে রাজি হয়েছিলেন বলে পত্রিকাটি জানিয়েছেন। পত্রিকাটি এও জানিয়েছে, ভবিষ্যতে মমতা রাজি হতে পারেন, তবে ২৫ হাজার কিউসেকের বেশি পানি দেবেন না। পত্রিকাটি অন্যত্র বলছে, 'মাঠে শুকিয়ে যাচ্ছে ধান, বর্ষাতেও তিস্তা ব্যারেজের জল চাইছেন চাষিরা এবং তথ্য দিয়েছে, 'বাঁচল উত্তরবঙ্গ' শিরোনামে। প্রথমে জলবিদ্যুৎ। বর্তমানে ব্যারাজ পয়েন্টে ৩টি ইউনিটে ৬৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দরকার ৩৩০ কিউসেক হারে পানি;

কিন্তু মেলে না ১৫০ কিউসেকের বেশি। এমনকি একটি চলে তাও জানুয়ারি-এপ্রিলে অর্ধেক দিনই উৎপাদন থাকে বন্ধ। বর্তমান চুক্তি হলে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে বলেছে। সেচ প্রকল্পে বোরো মৌসুমে পানি মেলে মাত্র ২৫ হাজার হেক্টরে যেখানে জমির পরিমাণ ৬০ হাজার হেক্টর। পানীয়জল নিয়ে যে তথ্য দিয়েছে তাহলো- 'চুক্তি হলে শুষ্ক মৌসুমে ক্যানালে জল কমে যেত, ব্যাহত হতো শিলিগুড়িসহ গজলডোবা প্রকল্প। ভুক্তভোগী চাষিরা বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করেছেন'। শিরোনামই বলছে, চুক্তি না হওয়ায় তারা কত খুশি। এরকম বহু পরিসংখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তিস্তা চুক্তি, যার মুল চাবি পশ্চিমবঙ্গের হাতে। তাই চুক্তি যদিও হবে ভারতের সঙ্গে কিন্তু তার আগে দরকার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক তৈরি করা, যাতে তারা অনুভব করে বাংলাদেশের মানুষের প্রয়োজনীয়তা। এর জন্য যত না দরকার রাজায়-রাজায় সম্পর্ক তার চেয়ে বেশি দরকার দুপারের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, যোগাযোগ, বন্ধুত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ভারতে বাংলাদেশের কোনো টিভি চ্যানেলই এখনো দেখা যায় না। এটুকু হলেও তারা বাংলাদেশের মানুষের অনুভব, চাহিদা, স্বপ্ন এগুলো জানতে পারতো। আর এখনই প্রয়োজন এ বন্ধন তৈরির উদ্যোগ নেয়া।

তারা নিউজ চ্যানেলের আলোচনায় বলা হয়েছে, ভারত বিপাকে ফেলেছে হাসিনা সরকারকে। আকাশচুম্বী প্রত্যাশা হঠাৎ 'ঢাকা'কে নিরাশায় ঢেকে দিয়েছে। তবুও মমতার সমর্থনে তারা। যাই ঘটুক, এখন মমতাই আসল নায়ক পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে; এমনকি তিনি এক্ষেত্রে নাকি বামদের চেয়েও সফল। তবে কি 'বাংলাদেশ-বিরোধিতা' এখন ভারতেও সফল রাজনৈতিক কৌশল বলে বিবেচিত? যা ভারত বিএনপি'র বিরুদ্ধে সব সময় করে থাকে। যদি সমীকরণটি তাই হয়; তাহলে আমাদের জন্য যে কোনো দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অর্জন বেশ জটিল হয়ে গেল সন্দেহ নেই।

এখন আমাদের করণীয় কি? এমন হোমওয়ার্কের দরকার; যাতে নদীর পানি ভাগাভাগীর একটা ফ্রেমওয়ার্কের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বুঝান যায়। এর জন্য প্রয়োজন, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শিক্ষা সফর, যৌথ সেমিনার, সিভিল সোসাইটির মধ্যে যোগাযোগ; যাতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিয়ে একদল মানুষ কথা বলে। এটুকু না করতে পারলে ভবিষ্যতে রাজায়-রাজায় বন্ধুত্ব কোনো ফল যে বয়ে আনবে না; এটুকু জোরগলায় বলা যায়।

[দৈনিক ডেসটিনি, তারিখ: ১৩/০৯/২০১১ইং]

নারী: যে কথা হয়নি বলা

১. বাংলাদেশের নারীর বাস্তবতা

২. বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর উপস্থাপন

৩. শ্রম শোষণের চক্রে নারী

৪. নারীর আত্মহত্যা: দায়ভার কার

বাংলাদেশের নারীর বাস্তবতা

এই কিছুদিন আগেই শেষ হলো বিশ্ব নারী দিবস। সারা বিশ্বে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্ব নারী দিবস পালন করা হলো। এমনকি বাংলাদেশেও নারীর অধিকার কিংবা নারীর সফলতা নিয়ে বেশ হৈচৈ করা হচ্ছে। আর তাই এ প্রশ্নটি বারবার আমার মাথায় এসেছে এ দেশের কতজন নারী এই দিবসের খবর রাখে। কৌতুহলী হয়ে আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই সেখানকার ডেস্ক অফিসার মেয়েটিকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'স্যার এসব আমি ভুলেই গেছি'। যেখানে গড়ে ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে সেখানকার নারী-রা এসবের কিছুই জানে না। এটি একেবারে শহরকেন্দ্রিক। বিষয়টি হয়তো কিছুটা সত্য, তবে এমন দিবস দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বয়ে আনতেও পারে, যা ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কোন সমাজের নারীচিত্র সে সমাজের অবস্থা বুঝতে সহায়তা করে। এমনকি বলা হয়ে থাকে নারীর 'মর্যাদা ও অবস্থান' দ্বারা সমাজের অবস্থানও নির্ধারিত হয়। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে ২০১০-এর নারী মানবাধিকার চিত্র উপস্থাপন করা যেতে পারে। নারী বিষয়ক এ সংখ্যাতত্ত্ব আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রতন্ত্রে নারী কতটা নিরাপদ, কিংবা তার নিরাপত্তা দিতে আমরা কতটা সক্ষম।
নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র-২০১০ দেখা যায়, এ বছরে এসিড নিক্ষেপে আহত হয়েছে ১৩৯, এসিড নিক্ষেপের নিহত ৩, ফতোয়ার শিকার ৩৮, পারিবারিক কলহে নির্যাতনের শিকারে আহত হয়েছে ৮৬, পারিবারিক কলহে নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত ২৫৪, যৌতুকের কারণে হত্যা ২৪৯, যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার ১২২, রহস্যজনক মৃত্যু ১২৩, ধর্ষণের পর হত্যা ৩৪, গণধর্ষণের শিকার ১৭, জেল হাজতে মৃত্যু ২৪, গৃহ পরিচারিকা নির্যাতনের শিকারে আহত ৩২, গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের শিকারে নিহত ৪৫, অপহরণ ৬৩, আত্মহত্যা ৩৪৫, পাচার ৪, ইভটিজিংয়ের শিকার ২৭৩ জন, (সূত্র : মানবাধিকার উন্নয়ন উদ্যোগ ফাউন্ডেশন, ২২/২০-এ, খিলজী রোড, ঢাকা) {দৈনিক পত্রিকার উপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি তৈরি হয়েছে}।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, ২০১০ সালে হাজার ১৮৫১ জন নারী নানারকম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যার মধ্যে আহত হয়েছে ৭৭৪ জন আর নিহত হয়েছে ১০৭৭ জন। আহত হওয়ার কারণ হিসেবে 'এসিড সন্ত্রাস' সবার শীর্ষে। ১৩৯ জন নারীর মুখমণ্ডল ঝলসে গেছে এসিডে। এর পরেই আছে 'যৌতুকের কারণে নির্যাতন'। যার সংখ্যা

১২২। ঘটনা দুটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। আর তা হলো একটি বিয়ের আগে এবং অন্যটি পরের ঘটনা। একজন কিশোরীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অথবা গর্হিত প্রস্তাবনায় কোন পুরুষের প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে প্রতিশোধ হিসেবে পুরুষ 'এসিড' ব্যবহার করে থাকে। অন্যটি প্রিয় নারীকে কাছে পাওয়ার পরে সেই পুরুষই নির্যাতন করে থাকে 'যৌতুকের' নামে। ঘটনা দুটির মধ্যে এই যে যোগসূত্র তা কিছুটা অদ্ভুতও বটে। তবে এর মধ্যেও পুরুষের 'পৌরুষ' মানসিকতায় দায়ী। কারণ সে মনে করে পুরুষ হিসেবে তার কর্তৃত্বের অধিকার চূড়ান্ত নারীর ওপর। আর তা থেকেই আসে ধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ। ২০১০ সালে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৭ জন নারী এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৪ জনকে। অর্থাৎ এখনো নারকীয়তা ভয়াবহভাবে উপস্থিত। 'ফতোয়া' এবারও আলোচিত হয়েছে এবং ৩৮ জন নারীকে ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আদালত বহির্ভূত শাস্তির ব্যবস্থা বা কেবল নারীরই জন্য।

নারীর আত্মহত্যা এখন পর্যন্ত বড় সামাজিক সমস্যা। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ৩৪৫ জন নারী আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা যখন কোন সমাজে ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয় তখন সামাজিক সংহতি সংকটাপন্ন নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কারণ ব্যক্তি যখন বেঁচে থাকার মতো সব অবলম্বন থেকে বঞ্চিত হয় তখনই সে আত্মহত্যা করে। বাংলাদেশে নারীর আত্মহত্যা ব্যাপক এবং কিছুটা অনালোচিতও বটে। প্রকৃত সত্য হলো রাষ্ট্রের নীরব ভূমিকা পারে না নারীকে বেঁচে থাকার মতো স্বপ্ন দেখাতে, যা আমাদের সমাজের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচায়ক। লক্ষ্য করা যায়, বহু আলোচিত ইভটিজিংয়ের সংখ্যা কম নয়। এত কিছুর পরও ২৭৩ জন কিশোরী ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বেশ কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যে বিষয়টি বেশ আতঙ্কিত করেছে তাহলো, জেল হাজতে ২৪ জন নারীর মৃত্যু। কিভাবে জেল হাজতে এত জন নারীর মৃত্যু হলো তা স্পষ্ট নয়। তাহলে কি এ কথা বলা যায় না, রাষ্ট্রের হাতে এখনো নারী নিরাপদ নয়।

সংখ্যাতত্ত্বের উপর আমার আস্থা কম কারণ প্রায় ক্ষেত্রেই সংখ্যার বাইরে বিরাট সংখ্যা অপেক্ষা করে যা আমরা জানি না। আবার কখনো একটি ঘটনা আমাদেরকে বিমূঢ় করে, ইঙ্গিত করে সীমাহীন ব্যর্থতার, কি সমাজ বা রাষ্ট্রতন্ত্রের। আলোচনাটি শেষ করব একটি ঘটনা দ্বারা যা সবার জানা। ফেলানীর মৃতদেহটা কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে ছিল অনেকটা সময়; অনেকে বাংলাদেশই ঝুলে ছিল বলেছে। ছোট্ট কিশোরী, যে হয়তো হাতের মুঠোয় পৃথিবী ধরার স্বপ্ন দেখেনি, কিন্তু নিশ্চয়ই বাংলার জল, বায়ু আর নীল আকাশের নিচে দৌড়ঝাঁপ করে বাঁচতে চেয়েছিল; এবং ভাবতে কষ্ট হয় না দরিদ্রতার মাঝেই। হলফ করে বলতে পারি ও নিশ্চয়ই কাজী

নজরুল ইসলামের কবিতার এ লাইনটিও জানত না 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছো মহান'। ... অতঃপর কত কি-ই না তাকে নিয়ে বাংলাদেশের চলছে কিন্তু প্রকৃত সত্য একটাই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে তাকে বাঁচাতে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কোন মিছিলের সামনে হঠাৎই যদি ফেলানীর মৃতদেহটা দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে...। বাস্তবতা হলো নারীর এই অবদমন, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রয়োজন সোচ্চার সামাজিক কণ্ঠস্বরের, বর্তমানে যার বড়ই অভাব। আর তার জন্য কেবল শহর নয় গ্রামীণ নারীদেরও সম্পৃক্ততা অতি প্রয়োজন।

[দৈনিক সংবাদ, তারিখঃ ০৩/০৪/২০১১ইং]

বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর উপস্থাপন

বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর উপস্থাপনা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক, যেখানে নারী নিজেও পণ্য। নারীর দৈহিক আবেদন, গ্ল্যামার, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় পণ্যটির বাজার তৈরি করা কিংবা কাটতি বৃদ্ধি করার জন্য।

ঠিক কবে, কোথায় বিজ্ঞাপনে নারীকে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল তার সঠিক তথ্য জানা নেই। কিংবা কেন নারীকে পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল তার উত্তর হয়তো যাদের মস্তিষ্ক থেকে এ আইডিয়া বের হয়েছিল তারাই দিতে পারেন। কিন্তু এটি ঠিক গ্লোবালাইজেশনের আজকের যুগে যেখানে মুনাফাই হচ্ছে বাণিজ্যের প্রথমত এবং শেষত, একমাত্র লক্ষ; সেখানে 'নারীকে' পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণে ব্যবহার নিয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা হতেই পারে এবং আমাদের মতো 'আধা রক্ষণশীল-আধা আধুনিক' সমাজে আলোচনা যথেষ্ট যৌক্তিকও বটে। বিষয়টি কেবল নৈতিকতার নয়, এটি নারী অধিকারের সঙ্গেও জড়িত। তবে বলে নেয়া ভালো, বর্তমান আলোচনায় 'বিজ্ঞাপনচিত্রে নারী'র উপস্থাপনাকে যথাযথ বিশ্লেষণের সঙ্গে তুলে ধরা হবে যেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলনের সুযোগ নেই। প্রথমেই নিরীক্ষা করা হবে বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর এ উপস্থিতি কতটা বাণিজ্যিক, কতটা প্রতিভার স্ফুরণ। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য হলো পুজির পুনঃপৌণক বৃদ্ধিকরণ এবং এজন্য যে কোন কাজ করতে পুঁজিবাদী সমাজ রাজি। পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন, বাজারে উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয় উৎপাদক শ্রেণীকে বাধ্য করেছে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে লোভনীয়ভাবে পন্যের উপস্থাপনে। যার অন্যতম পদক্ষেপ বিজ্ঞাপন; যাতে ঘরে বসেই জানতে পারে পণ্যটি সম্পর্কে। উৎপাদক ব্যবসায়ীক স্বার্থে সেটি করতেই পারে, প্রশ্নটি ওঠে যখন 'নারীকে' সেই পণ্যের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়। উদ্দেশ্য সেই নারীর 'শারীরিক আবেদন' পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। পুরুষ ক্রেতারা আকৃষ্ট হবে পণ্যটি ক্রয়ে। এখানে যে প্রশ্নটি 'উত্তরহীন' অবস্থায় লুকিয়ে থাকে তাহলো 'বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত নারীও কি পণ্য' আকারে উপস্থিত হচ্ছে? এখানে শালীন-অশালীন প্রশ্নটি বিলম্বে বিবেচ্য।

প্রথমেই আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হাল আমলের একটি অ্যাডের কথা না উল্লেখ করে পারছি না। 'রবির রঙে বাংলাদেশ' নামক অ্যাডে দেখানো হয়েছে অনেকগুলো মেয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নেচে চলেছে। কখনো বৃষ্টিতে ভিজে, কখনো জলে সাঁতার কেটে, দল বেঁধে নেচে চলেছে। জনপ্রিয় একটি মোবাইল কোম্পানি রবির বিজ্ঞাপন এটি। আর একটি কথা বলি, এলিট পেইন্টের একটি অ্যাড 'রাঙিয়ে দাও'-এ দেখা

যায় একটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে, তার চুড়ি বেয়ে জল পড়ছে টুপটাপ; এখন প্রশ্নটি দেখা দিতেই পারে মুল বিষয়বস্তুর সঙ্গে নারীর এ উপস্থাপন কতটা যৌক্তিক?

এখানে দুটি দিক, একদল মেয়েকে লাল রঙের (রবির রঙ) পোশাকের মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে; এবং আবার সেই সাধারণ ধারণা থেকে 'পর্দায় নারীর উপস্থিতি দর্শকের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে'। একেবারে শেষে জানা যায় মূল কোম্পানির নাম, উপস্থাপিত এলিট পেইন্টের অ্যাডটিকে, বড়জোর কাব্যিক বলা যায়; তবে একটি মেয়ের এ উপস্থাপনা কিছু প্রশ্ন জন্ম দিতেই পারে। নারী এখানে একেবারে 'পণ' কিনা? উত্তরটি হচ্ছে 'হ্যাঁ' অবশ্যই।

নারীকে বিজ্ঞাপনচিত্রে উপস্থাপন সম্পর্কিত একটি বিশ্লেষণ হলো পণ্যের মডেল হিসেবে নারীর এ উপস্থাপনা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক, যেখানে নারী নিজেও পণ্য। নারীর দৈহিক আবেদন, গ্লামার, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় পণ্যটির বাজার তৈরি করা কিংবা কাটতি বৃদ্ধি করার জন্য। যেখানে নারী হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব সত্ত্বা, অস্তিত্ব, এমনকি মানবিক বিষয়গুলোও।

এ বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো বারবার সামনে আসে তার মধ্যে যেমন 'নারীর আপন সত্তা হারিয়ে যাওয়া' তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিকতার প্রশ্নটি। অর্থাৎ কোন পণ্যে যিনি বা যারা মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছেন তারা পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে কতটা নিশ্চিত? পণ্যের দাম সম্পর্কে অজ্ঞ হলে অসংখ্য ভোক্তাকে চোখ বুজে ধোঁকা দিচ্ছেন স্রেফ টাকার কারণে। দ্বিতীয় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অন্য বিষয়টি হল 'সামাজিক দায়বদ্ধতা'। বিখ্যাত মডেল/অভিনেত্রী যিনিই হোন না কেন সমাজের প্রতি তারও যে দায়বদ্ধতা আছে তা তারা ভুলেই যান। এ দায়হীনতার প্রথমটি হলো আপন সংস্কৃতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন এবং দ্বিতীয়টি হলো নিশ্চিত না হয়েই অন্যকে প্রলুব্ধ করা পণ্যটি ক্রয়ে।

এ প্রসঙ্গে ভারতজুড়ে Fair and Lovely নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার উদাহরণ দেয়া যায়। All India Democratic Women's Congress এর সাধারণ সম্পাদিকা Brinda Karat বলেছেন Fair & Lovely-এর বিজ্ঞাপন প্রচারনা 'Highly racist'। তিনি এখানেই থামেননি, শুধু ত্বকের রঙকে পুঁজি করে ব্যবসাকে তিনি "Discriminatory on the basis of skin and an affront to a women's dignity" বলেছেন। এ প্রসঙ্গে Institute of Dermatology Thailand-এর

Director Preya Kullaraijgya তার লেখায় বলেছেন (Fair & Lovely cream) Whitening creams sell like hot cakes, although there is no documented benefit'. তাছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, এ product-টি এখনো পর্যন্ত Pharmaceutical product হিসেবে categorized হয়নি। অথচ শুধু ভারতেই এ বাবদ ২০০৬ সালে কোম্পানিটির বিনিয়োগ ছিল ২০০ মিলিয়ন ডলার। শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে বিশ্বজুড়ে মহিলাদের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে বিপুল মুনাফা তারা হাতিয়ে নিচ্ছে (বিস্তারিত দেখুন- Doing Well by Doing Good; Case Study; Fair & Lovely Whitening Cream by Anil Karnani; Michigan Ross school of Business- 2007).

বাংলাদেশে এক গবেষণায় ইসলাম এবং তার সহযোগীরা জানিয়েছে Fair & Lovely বাংলাদেশ advertizing বাবদ ৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে (উদ্ধৃতি পূর্বোক্ত)। আর পুজির এই প্রচন্ড প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা কিংবা আপন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। প্রশ্ন হতে পারে TV Commercial নিয়ে এত আলোচনা কেন? আসলে বর্তমানে বাংলাদেশে TV এবং Dish-culture সব বয়সী মানুষকে ভিশন প্রভাবিত করছে এবং বেশি প্রভাবিত করছে টিনএজ বাচ্চাদের। উঠতি বয়সী মেয়েরা এখন মেধার চর্চার থেকে চেহারার চর্চাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়, সব শহরে পার্লারের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে। তাই এ প্রজন্মের কেউই আর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল কিংবা রুনা লায়লা হওয়ার স্বপ্ন দেখে না এখন তারা কোন মডেল, অভিনেত্রী কিংবা র‍্যাম্প নর্তকী হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

আজকের পর্বটি শেষ করবো বাংলাদেশের TV channel গুলোতে প্রচারিত একটি পণ্যের অ্যাড দিয়ে। পর্দায় দেখা যায় অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কয়েকজন মেয়ে গান গেয়ে থাকে, 'হাজার দর্শকের মন মাতাইয়া, নাচেগো সুন্দরী মন মাতাইয়া... খাইতে খাইতে যায় বেলা... পরিবারের সবাই একসঙ্গে TV দেখা অবস্থায় এ বিজ্ঞাপন যখন প্রচার হয় তখন অনেকের উঠে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বলতে বাধ্য হচ্ছি, এর মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির কণা মাত্র নেই, অন্যটি অনুপস্থিত অথচ উপস্থিত একঝাঁক মেয়ে যারা নিজেরাই পণ্য হিসেবে উপস্থাপিত। এখানে পর্দায় নারী হয়ে উঠেছে যৌন-জীব (Sexual object) যাকে Countley এবং Whipple বলেছেন. 'Sexual object as, where women had no role in commercial, but appeared as an item of decoration'.

এ আলোচনা কেবল বিজ্ঞাপনেই নয় ইদানীং অনেক বিল বোর্ড, পত্রিকার কভার পেজ নিয়েও হতে পারে। একাধিক বিল বোর্ডে লক্ষ করা যায় তাদের পণ্যে নারীর ছবি এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে সাধারন মানুষ চলার পথে বিল বোর্ডে চোখ রাখতে বাধ্য হয়। প্রথমে চোখে পড়ে অর্ধনগ্ন নারীর ছবি এবং পরে চোখে পড়ে পণ্যটি। এ লেখার জন্য আমি ঢাকা শহরের অনেক বিল বোর্ড এবং সেই সঙ্গে পত্রিকায় কভার পেজ অনুসন্ধান করেছি কেবল তথ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার কভারে ছবি কেবল অশালীনই নয় বরং কখনো কখনো তা পর্ণের কাছাকাছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব তদারকি করার কোন সংস্থা আছে কি? হয়তো আছে, তবে কতটুকু নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে আমরা জানি না।

বর্তমান আলোচনাটি কেবল কোন নান্দনিক উপস্থাপন তৈরীর জন্য নয়। এর সঙ্গে যে বিষয়গুলো জড়িত তার মধ্যে আমাদের জাতীয় মুল্যবোধ, জাতীয় সংস্কৃতি, বাঙালিত্ব, যার বছরের সাংস্কৃতিক অর্জন সবই রয়েছে। ইচ্চা করলেই যেন-তেন হারে নারীকে উপস্থাপন করা নারী উন্নয়ন নয়। যেসব মেয়েরা ইদানিং মডেলিংসহ এমন পেশায় আছে যেখানে সহজেই কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আয় করা যায়; ভাবতে পারে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্েছ কিংবা মেয়ে হিসেবে এসব করার অধিকার তার আছে। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, না, এর সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যেই হই না কেন, নারী কিংবা পুরুষ যা ইচ্ছা তা করতে পারি না। কারণ জাতীয় সংস্কৃতি এবং মুল্যবোধের সঙ্গে যা সাংঘর্ষিক তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা হাজার বছরের তৈরি সংস্কৃতি থেকে অবশ্যই গ্রহণ করব কিন্তু আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। একটা উদাহরন দিচ্ছি, নিকট অতীতে ফ্রান্সে মুসলিম মেয়েদের স্কুলে মাথায় স্কার্ফ বাঁধা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে আদালতের রায়ের মাধ্যমে। আদালত বলেছে, এটি ফ্রান্সের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাই মুসলিম মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ পরা সে দেশের স্কুলে নিষিদ্ধ হয়েছে। আবার তার অর্থ এও নয়, মেয়েরা কি মডেলিংসহ নান্দনিক উপস্থাপনায় অংশ নেবে না? অবশ্যই, তবে সেখানে 'নারীর মহিমায় যেন গীত হয়'; মোটেও পণ্য হিসেবে নয়। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনে ব্যাপকভাবে যারা নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন তারা অনেকেই পর্ণ-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে বলে পত্রিকান্তরে খবর বেরিয়েছে। প্রকৃত সমস্যাটি এখানে, তারা নিজেরাও জানে না বাজারব্যবস্থা তাকে শোষণ করছে কখনো 'ভিজুয়াল পণ্য' আকারে আবার কখনো তাকে 'পর্ণ-বাণিজ্যের' পণ্য হিসেবে। এসব রোধ করতে অবশ্যই মেয়েদেরকে সোচ্চার হতে হবে। কারণ ইদানিং 'মডেলিং' ব্যবসা আকারেও ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা শহরে একাধিক স্থানে মডেলিংয়ে প্রশিক্ষণের নামে অনেক

মেয়েই এসব স্থানে গিয়ে প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছে, যা পত্রিকান্তরে আমরা জেনেছি। অর্থাৎ বিষয়টি কেবল বিজ্ঞাপনচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; এটি সমাজ চিত্রেও এসে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রকৃত সমস্যা হিসেবেই।

'সর্বজয়া' কাগজে এ লেখনীর মাধ্যমে একটা ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা হতে পারে। আমরা মনে করি, পাঠকদের এ বিষয়ে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন জরুরি। তাহলে নারীর যেন-তেন ভাবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সবাইকে সাহায্য করবে। এ লেখাটি হতে পারে তার উপক্রমণিকা মাত্র। আমরা নানা মতের উপস্থাপনার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

[দৈনিক সংবাদ, তারিখঃ ১৭/০৪/২০১১ইং, তারিখঃ ২৪/০৪/২০১১ইং, তারিখঃ ০১/০৫/২০১১ইং]

শ্রম শোষণের চক্রে নারী

গত তিন দশক ধরে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শ্রমশক্তির নারীমুখীকরণ (Formalization of labor force) লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচির আওতায় (SAP) জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালাতেও শ্রমশক্তির নারীমুখীকরণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। উদ্যোগটি হয়তো প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এদেশের নারীরা শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে ঠিকই কিন্তু শ্রম শোষণের চক্রে তারা হচ্ছে শোষিত। ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদেরকে অধিকতর প্রান্তেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে যদিও নারীর শ্রমকে সস্তা মূল্যে ক্রয় করে স্ফীত হচ্ছে পুঁজিবাজার। নারী শ্রমিকের অধিকার বিষয়ক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ হলেও এখনো কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তার নেই কোন গ্যারান্টি। এমনকি তারা এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশেও কাজ করে যা নারী শ্রমিকের জন্য নিষিদ্ধও বটে। ১৯৯৭ সালে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা যায়, এদেশে ৪৭% নারী কর্মক্ষেত্রে তার সহযোগী দ্বারা নির্যাতিত হয়।

আশির দশকে ব্যাপকহারে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠলে সেখানে বহু ছিন্নমূল গ্রামীণ নারী শ্রমিকরূপে যোগদান করে। রাতারাতি বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প নারীর সস্তা শ্রমে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলো গার্মেন্টগুলোর চাকরির পরিবেশ এবং প্রায়ই দুর্ঘটনায় অনেক নারী শ্রমিকের জীবন নাশের কারণ হয়ে ওঠে। এমন কি ইটভাটা, চাতাল (যেখানে শাল প্রক্রিয়াজাত করা হয়), হোটেল-রেস্টুরেন্টে যেসব মেয়ে কাজ করে তাদের জন্যও নেই আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম অধিকারের কোন বাস্তবায়ন।

কেস স্টাডি-১

ফারিয়া একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানার রিসিপশনিস্ট। তিনি জানালেন মেয়ে হিসাবে এ পেশা ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়। কারণ চাকরি থাকা না থাকা নিভর্র করে বসের খেয়ালখুশির উপর। ফলে মন রাখা গোছের আচরণ করতেই হয়। এমনকি অফিস আওয়ারের পরেও অনেক সময় অফিসে থাকতে হয়। যার নিজের মনের বিরুদ্ধে তাই নয়- মর্যাদার হানিও বটে।

কেস স্টাডি- ২

রুমকি সিরাজগঞ্জের মেয়ে। নদী ভাঙনে সবকিছু হারিয়ে গ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছে গার্মেন্টে কাজ করতে। প্রায় চার বছর এ কাজে আছে। নাইট শি্ফট নিয়ে তার অভিযোগ। তাছাড়া বেতন খুবই স্বল্প। যেসব সুপারভাইজার আছে তাদের দ্বারা সে নিগৃহের শিকার হয়েছে। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না চাকরি

হারানোর ভয়ে। নাইট শিফটে কাজ করা নিয়ে তার যথেষ্ট আপত্তি, কারণ এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে সে।

কেস স্টাডি- ৩

সফুরা বগুড়ার মেয়ে। বগুড়া শহরের পাশেই চাতালে কাজ করে। উত্তরাঞ্চলে চাতালের রমরমা ব্যবসা। এ সেক্টরে মেয়েরাই মূল শ্রমিক। কিন্তু সরেজমিনে কাজ করতে গিয়ে জানা গেছে চাতালের মালিক দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে অনেক নারী শ্রমিক। সফুরা সে কথা নিজেও স্বীকার করল। তার কারণ চাতালেই তাদের রাতে থাকতে হয়। আর মালিক কে খুশি না রাখলে চাকরি থাকে না।

ঘটনা বিশ্লেষণ

কেস স্টাডিগুলো থেকে যেসব সত্য বেরিয়ে এসেছে তা হলো চাকরি ক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তাহীন। বিশেষত দুটি বিষয় চিহ্নিত হয়েছে- প্রথমত: নৈশকালীন চাকরি নারী শ্রমিকের জন্য নিরাপদ নয় এবং দ্বিতীয়তঃ অনেকাংশে মালিককে খুশি রাখার উপর তাদের চাকরি থাকা-না-থাকা নির্ভর করে।

এখন দেখা দরকার আইএলও কনভেনশন নারীর চাকরি বিধিতে কি নিরাপত্তা প্রদান করেছে। আইএলও কনভেনশনের ৮৯নং ধারা (সংশোধিত ১৯৪৮ এবং খসড়া চুক্তি ১৯৯০) অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান নারীদের জন্য নৈশকালীন চাকরি নিষিদ্ধ। এখানে নৈশ্য বলতে রাত ১০ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত কাজ করা বুঝায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি চাতাল, হোটেল, রেস্টুরেন্টসহ আরও কিছু শিল্পে মেয়েরা সারা রাত অথবা রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করছে। নারী শ্রমিকদের এসব কাজ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এখনই নির্দেশ প্রদান করা উচিত।

কনভেনশনের ১৫৮ নং ধারায় (১৯৮২) বলা হয়েছে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিককে চাকরি থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখজনক হলো চাতাল ও গার্মেন্টে নারী শ্রমিকের চাকরি থেকে বহিষ্কারের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মানা হয় না। এক্ষেত্রে মালিকদের খেয়াল-খুশিই যথেষ্ট।

অধিকাংশ সেক্টরে যেখানে বহু নারী শ্রমিক রয়েছে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোন ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা সংগঠন করতে পারছে না। অথচ আইএলও কনভেনশনের ৮৭নং ধারানুযায়ী (১৯৪৮) সব শ্রমিকের জন্য সমিতি গঠনের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার

সুযোগ দেয়া উচিত। যাতে নারী শ্রমিকরা হতে পারে সংগঠিত এবং এভাবে শোষিত ও নির্যাতিত না হয়। আমাদের শ্রমশক্তির অর্ধেকই নারী। তাদের শ্রমের যথাযথ ব্যবহার ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা প্রদান, আইএলও সনদ অনুযায়ী চাকরি ও শ্রম অধিকারের গ্যারান্টি এবং দেও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করাসহ নারী শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এমন নীতিমালা বাস্তবায়ন করা উচিত যাতে কর্মক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

[দৈনিক সংবাদ, তারিখঃ ১০/০৭/২০১১ইং]

নারীর আত্মহত্যা: দায়ভার কার

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? এ প্রশ্নটিই এখন পর্যন্ত রহস্যাবৃত যার সুনির্দৃষ্ট উত্তর কিংবা সমাধান আমাদের হাতে নেই। মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রবিদরা এ বিষয়ে নানা মত প্রদান করেছেন যা একটি একমুখী ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। বরং প্রতিটি বিজ্ঞানই যেন তার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। ফলে পাঠকরা এ বিষয়ে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে আরও জটিলতায় নিমগ্ন হয়েছেন।

এ বিষয়ে এমিল ডুর্খীম রচিত বই Suicide: A study in sociology-তে যে দীর্ঘ আলোচনাটি করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে এখানে দু'একটি কথা উপস্থাপন করছি যা আত্মহত্যার মতো বিষয়ের জটিলতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে। বাংলাদেশে ইতিপূর্বে এ বিষয়ে যা লেখালেখি হয়েছে সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল একাডেমিক ডিগ্রি অর্জন। ফলে নানা সীমাবদ্ধতা গবেষককে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে। আমরাও বিজ্ঞানমুখী আলোচনা থেকে হয়েছি বঞ্চিত। বর্তমান নিবন্ধে আমরা সে বঞ্চনা থেকে মুক্ত হতে চাই। পাঠক বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা যেন প্রতিপাদ্য বিষয়ে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেটিই বর্তমান লেখনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে বলেই নিচ্ছি, এখানে ডুর্খীমের তত্ত্ব আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বাংলাদেশের নারীর আত্মহত্যা ব্যাখ্যা করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই আলোচনা করব এবং ডুর্খীমের তত্ত্ব বাংলাদেশের জন্য কতটা প্রযোজ্য তাও সংক্ষেপে তুলে ধরব। ডুর্খীমের তত্ত্ব অনুযায়ী, আত্মহত্যা তিন প্রকার। যথা: ১. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide) ২. পরার্থপর আত্মহত্যা (Altruistic Suicide) ৩. নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide)।

সহজ কথায়, ব্যক্তি যখন নিজের কারণে আত্মহত্যা করে তখন তাকে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলে। যখন অন্যের কারণে নিজেকে উৎসর্গ করে তখন তাকে পরার্থপর আত্মহত্যা বলে। আর যখন সমাজে বিদ্যমান নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির কারণে আত্মহত্যা করে তখন তাকে নৈরাজ্যমুলক আত্মহত্যা বলে। এবং ডুর্খীমের মত অনুযায়ী, এসব আত্মহত্যার পিছনে মূল কারণ হলো 'সামাজিক সংহতির অভাব'।

এ তথ্যটুকু আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে সহায়তা করবে এবং আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান এবং তার আত্মীকরণ (assimilation) কিংবা জেন্ডার পার্থক্যকরণ (differenciation) তাকে কতটা সমাজপ্রান্তে

(periphery of life) ঠেলে দিচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করব। নারীর আত্মহত্যার বিষয়টি জেন্ডার ভায়োলেন্সের আওতাভুক্ত কিনা (?) সেটিও পুনঃবিবেচনাযোগ্য।

বাংলাদেশে বর্তমানে এ বিষয়ক আলোচনা ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, এখানে আত্মহত্যা নিয়ে যা দু'একটি গবেষণা হয়েছে তা একাডেমিক এবং ডিগ্রী অর্জনের জন্য। এমনো লক্ষ্য করা গেছে মাঠ পর্যায়ে গবেষক নিজে কখনো যায়নি। তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা ছিল যথেষ্ট দুর্বল। ফলে সেসব গবেষণায় যে সিদ্ধান্ত এসেছে তা একেবারে খাপছাড়া এবং বাস্তবতাবর্জিত। এর মাধ্যমে ডিগ্রী হয়তো হয়েছে কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে গবেষণা হয়েছে সে সমস্যা বেড়েছে বৈ কমেনি। বলা যায় এটি একাডেমিক গবেষণার প্রচন্ড দুর্বলতাও। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো আমাদের এখানে প্রায়োগিক গবেষণা (applied research) বর্তমানে পৃথিবীর যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্বল, আর প্রায় নেই বললেও চলে। বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানে 'প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক' গবেষণার যে অভাব তার ফলে সামাজিক সমস্যার বিস্তার থেকে আমরা মুক্ত হতে তো পারিইনি বরং বিস্তার লক্ষ্য করছি অপলকে, যেন আমাদের কিছুই করার নেই। এমনকি আমরা এ সমস্যা নিয়ে কোন action research ও হাতে নিতে পারিনি। এক্ষেত্রে আত্মহত্যা কিংবা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দুটিই প্রযোজ্য। আর সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তারা হয়তো জানেই না এটা সামাজিক সমস্যা এবং তাদের দায়িত্ব আছে মানুষকে সচেতন করার। এখানে বলে নেয়া দরকার- আমি দীর্ঘদিন এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি আর সে অধিকারেই আমার বর্তমান লেখা। আমরা বাংলাদেশের বাস্তবতায় এ সমস্যাটিকে বুঝতে চেষ্টা করব। এ বিষয়ক ছোটখাটো গবেষণার সাহায্যও নেয়া হবে। প্রথমেই এটি সামাজিক সমস্যা কিনা এবং তার প্রতিকারের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন কিনা সে বিষয় তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তবে বলে নিচ্ছি, এ বিষয়ক কোন জাতীয় তথ্য ভান্ডার নেই। বিভিন্ন উৎস থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যেখানে আত্মহত্যার প্রকৃত সংখ্যা অনুপস্থিত।

যদিও সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই, তবু ধারণা করা হয় প্রতিবছর ২৫০০-৩০০০ জন লোক এদেশে আত্মহত্যা করে থাকে এবং ২০১০ সালে এদেশে ৩৪৫ জন নারী এবং ১৩৫ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছে (মানবাধিকার উন্নয়ন উদ্যোগ ফাউন্ডেশন, ঢাকা)।একথা বলতে একটুও দ্বিধা নেই এ সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা থেকে খুবই স্বল্প। পাঠকের সুবিধার জন্য ২০১১ সালের দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা আত্মহত্যার কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো-

ঘটনা: এক
৭ জুলাই ২০১১, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁ-এর চরকিশোরগঞ্জের চরহোগলা গ্রামে ইসমত আরা (২৮) তার ৭ বছরের শিশুসন্তানসহ স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করার খবর।

ঘটনা: দুই
৭ জুলাই ২০১১ আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের বেতাপুর গ্রামে পারুল আক্তার (১৭) ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করার খবর।

ঘটনা: তিন
৭ জুলাই ২০১১, আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বগুড়া সদরের শিলা খাতুন বাবা-মায়ের ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করার বিষয়টি।

ঘটনা: চার
মাদারীপুর সদর উপজেলায় দাখিল মাদ্রাসার ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী শিরিন আক্তার ইউপি মেম্বারের সালিসে অপমান সইতে না পেরে ঘরের আঁড়ার সঙ্গে দড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। এই সংবাদটিও আগস্ট মাসের একুশ তারিখে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঘটনা: পাঁচ
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের ফেরদৌসী মাতব্বরদের দেয়া অপবাদ সইতে না পেরে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ৪ সন্তানকে জড়িয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেন। এই সংবাদটি আগস্ট মাসের উনিশ তারিখে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঘটনা: ছয়
আখাউড়া গৃহবধূ ভগবতী দাস দুই সন্তান নিয়ে পারিবারিক কলহের জের ধরে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করে। খবরটি আমার দেশ পত্রিকায় ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।
ঢাকার ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী রিবিতা বাবা-মার সঙ্গে অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। খবরটি দৈনিক ডেসটিনি পত্রিকায় ১০ অক্টোবর প্রকাশিত হয়।

আত্মহত্যার কারণ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি, 'স্বামীর সঙ্গে অভিমান, বাবা-মায়ের উপর অভিমান, সালিসে অপমান সইতে না পারা, মাতব্বরদের দেয়া অপবাদ সইতে না পারা, পারিবারিক কলহের জের' ইত্যাদি।

অর্থাৎ অপবাদ, স্বামীর অত্যাচার, সামাজিক সালিস, বাবা-মার শাস্তি, বাবা-মার কলহ' ইত্যাদি এখানে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ সমাজ কিংবা পরিবার সব ক্ষেত্র থেকেই আত্মহত্যাকারী এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছে।

বাংলাদেশে অপরাধের মূল কারণ হলো 'দারিদ্রতা'। এমনকি পুরুষের উপর নারীর যে নির্ভরশীলতা তাও পরিবারের মধ্যে তাদের 'দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক অসহায়তা থেকে উদ্ভূত'। দেখা যায়, ধনী পরিবারের মেয়েরাও এক অর্থে দরিদ্র কারণ তাদের হাতে অর্থ নেই যা তার মধ্যে 'অসহায়তা এবং নিরাপত্তাহীনতা' দুই আরোপ করে। আমাদের মতো এশীয় সমাজে বিশেষ করে এই উপমহাদেশে যার উৎপাদন ব্যবস্থা 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা' বলে পরিচিত এবং সমাজ চরিত্র 'আধা কৃষি-আধা-পুঁজিবাদী' সেখানে ইউরোপীয় মডেলে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে গেলে সত্যের দেখা পাওয়া যাবে না। বড়জোর একটা গোঁজামিল তত্ত্ব তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে আর গবেষকদের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রকৃত সত্য আবিস্কারের পথে হয়ে দাঁড়িয়েছে বাধা। ফলে আত্মহত্যা গবেষণায় ডুর্খীম-ই একমাত্র উপায়। এখন একটা উদাহরণ দেব, পাশের দেশ চীন থেকে। ২০১১ সালে চাইনিজ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, চীনে বছরে ২ লাখ ৮৭ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। দেশটিতে শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে আত্মহত্যার হার ৩ গুণ বেশি। অর্থাৎ ৭৫ ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে প্রত্যন্ত এলাকায় আর মাত্র ২৫ ভাগ ঘটে শহরে। ওই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটিতে পুরুষের চেয়ে নারীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। চীনে মানব মৃত্যুর পঞ্চম কারণ আত্মহত্যা। তবে ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুর প্রধান কারণই আত্মহত্যা। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, চীনে প্রতিবছর অন্তত ২০ লাখ মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। বলা হয়েছে, ১০ সেপ্টেম্বর চীনে আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালন করা হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য। এসব আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, আত্মহত্যা একটি 'জেন্ডার সমস্যা' যা নারীর আত্মহননের ভিন্ন ব্যাখ্যা দাবি করে। যদিও আমরা এর আগে বিষয়টির নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ দিয়েছি তবুও এ সমস্যাটিকে 'জেন্ডার লেন্স' দিয়ে বিশ্লেষণ জরুরি। যেহেতু অধিকাংশ আত্মহত্যাকারীই নারী তাই এর একটা বাড়তি গুরুত্ব আছে। প্রতিটি ঘটনার পেছনেই 'সমাজ মনস্কতা' এক ধরনের কারণ যা ব্যক্তিকে তাড়িত করে কোন আচরন করতে। আমাদের সমাজে লক্ষ করা যায়, নারীর প্রতি ব্যক্তির যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তা সে অর্জন করেছে সমাজ ঐতিহ্য থেকে। ফলে, ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের থেকে অধিক কাম্য হয়েছে। এমনকি 'মেয়ে লালনকে অন্যের গাছে পানি ঢালার' সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পরিবারের মধ্যে লালিত হওয়ার সময় একজন বোন লক্ষ্য করেছে তার ভাই বেশি সুবিধা পাচ্ছে সব ক্ষেত্রে, পোশাক থেকে শুরু করে খাবার-

এ পর্যন্ত। যা মেয়েটির মধ্যে একটা হীনমন্যতা তৈরি করে দিয়েছে। যখন সে স্বামীর সংসারে যায় তখন এ অবস্থা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। সে শিকার হয় সব রকমের বৈষম্যের, এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও। যার মূল কারণ, সে নারী। যাকে আমরা বলতে পারি 'জেন্ডার বৈষম্য'। আর এ বৈষম্য তাকে জীবনের প্রান্তে ঠেলে দেয়; তার সামনে আর কোন পথই খোলা থাকে না একমাত্র 'নিজেকে বিলিয়ে' দেয়া ছাড়া - যার নিশ্চিত পরিণতি আত্মহত্যা।

মোটকথা, সমাজই এর জন্য দায়ী। কিন্তু এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখনই সম্ভব নয়; তবে সচেতনতামূলক নানা পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সবাইকে সচেতন করার জন্য। দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে আত্মহত্যা এখনো একটা সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচিত নয়। কেবলমাত্র কিছু কিছু পাঠ্যসূচিতে এর অবস্থান। কিন্তু প্রয়োজন এখনই একে বড় ধরনের সমস্যা বলে চিহ্নিতকরণ এবং এ অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। পদক্ষেপগুলো হলো: সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় আত্মহত্যাকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা এবং প্রতিরোধের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা; 'জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করা যাতে সঠিক সময়ে ঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়; কিশোর কিশোরীরা যাতে আত্মহত্যা না করে তার জন্য প্রাইমারি-সেকেন্ডারি পাঠ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যাতে তারা সচেতন হয়; ব্যাপকভিত্তিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ (লিফলেট, যাপন, স্কুলে-হাসপাতালে পরামর্শমূলক পুস্তিকা বিতরণ- কমিউনিটি হাসপাতালে পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি) যা এ ঘটনা থেকে জনগণকে বিরত রাখবে; কোন একটি দিনকে 'আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেয়া (চীনের মতো); যা সমস্যাটির গুরুত্ব বুঝতে জনগণকে সহায়তা করবে।

[দৈনিক সংবাদ, তারিখঃ ২৩/১০/২০১১ইং, তারিখঃ ৩০/১০/২০১১ইং, তারিখঃ ৬/১১/২০১১ইং]

আত্মহত্যা ও সমাজ মনস্কতা

১. আত্মহত্যা: উপেক্ষিত সামাজিক সমস্যা

২. আত্মঘাতী হামলা বিশ্লেষণে গোঁজামিল তত্ত্ব

আত্মহত্যা: উপেক্ষিত সামাজিক সমস্যা

আত্মহত্যা সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিচিত বহুকাল থেকেই। বাংলাদেশে যেসব কারণে মানুষের অপমৃত্যু হয় আত্মহত্যা তার মধ্যে অন্যতম। যদিও বলতে বাধা নেই, প্রতিবছর বাংলাদেশে কত মানুষ আত্মহত্যা করে তার কোন পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। এর একটা বড় কারণ এ সমস্যার কোন জাতীয় ডাটাবেজ নেই। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং কিছু বিক্ষিপ্ত গবেষণা থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় বাংলাদেশে প্রতি বছরই প্রচুর মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে সেসবের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, 'আত্মহত্যা' আমাদের সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। লোকচক্ষুর অন্তরালে এ সংখ্যা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা অসম্ভব। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক প্রতিবেদনে বলেছে, কেবলমাত্র ২০১১ সালে বাংলাদেশে ১৯ হাজার ৬৯৭ জন আত্মহত্যা করেছে। বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত সংবাদপত্র ডেইলি স্টার জানিয়েছে, ২০০২-২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৭৩ হাজার ৩৪৯ জন আত্নহত্যা করেছে; যার মধ্যে ৩১ হাজার ৮৫৭ জন 'গলায় ফাঁস' এবং ৪১ হাজার ৫৩২ জন 'বিষপানকে' কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর সঙ্গে আর একটি তথ্য আমাদের আত্মহত্যার ভয়াবহতা বুঝতে বাধ্য করেছে। তাহল, ঢাকায় অবস্থিত শহীদ সোহরাওয়াদী হাসপাতাল কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় জানা গেছে (জানুয়ারী-এপ্রিল ২০১০ সালে কৃত গবেষণা), 'বাংলাদেশে ৬ লাখ ৫০ হাজার লোক আত্মহত্যাপ্রবণ' অর্থাৎ আত্মহত্যা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এ বিশাল সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের এ ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে বেশ সহায়তা করেছে। এসব আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে আবার অধিকাংশই নারী। এ তথ্য আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যে অসংগতি বিদ্যমান সেদিকে দিক নির্দেশ করছে। কোন সমাজে যখন এত বিশাল জনগোষ্ঠী আত্নহত্যা করে তখন সে বিষয়ে যেমন মননশীল গবেষণার দাবি রাখে; তেমনি মাঠ পর্যায়ে নানা কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে এ সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা করা জরুরি বৈকি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, রাষ্ট্রের কোন সংস্থাই এখনই পর্যন্ত এ সমস্যা নিয়ে তেমন কোন গবেষণা কিংবা ফলিত কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। আত্মহত্যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত যেসব গবেষণা হয়েছে তা একাডেমিক পর্যায়ের অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করার জন্য। তাও আবার এসব গবেষণা করা হয়েছে, মূলত ঝিনাইদহ জেলায়; যা বাংলাদেশের সুইসাইড জোন(?) বলে পরিচিত। যদিও অন্যান্য জেলাতেও প্রচুর আত্মহত্যা হয়ে থাকে কিন্তু সেসব স্থানে তেমন কোন গবেষণা করা হয়নি। ফলে একটি

একপেশে ধারণা তৈরি হয়েছে যা থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকেতও এ সমস্যার যে ভয়াবহতা রয়েছে সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বেশ দুরূহ হয়েছে। তবে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা বর্তমান নিবন্ধে একটি দীর্ঘ আলোচনা করব; যা আত্মহত্যার মতো সমস্যার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, কোন ব্যক্তি কেন আত্মহত্যা করতে চায়? যখন জীবন সবকিছু থেকে প্রিয়। ঘটনাটি কেবলই কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক? নাকি আত্মহত্যা সমাজ-কাঠামোতে বিদ্যমান অসংগতির প্রতিফলন। কোন ব্যক্তির দেহে জ্বর দেখা দিলে ডাক্তাররা যেমন রোগ অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ জ্বর নিজে রোগ নয়; এ ঘটনাও কি তেমনি? তাহলে সমাজদেহের কোন অব্যবস্থা বা অসংগতি এর জন্য দায়ী, তা জানা জরুরি বৈকি। বিষয়টি খুব জরুরি এ কারণে যে, বিশেষ করে যখন নারীরাই সর্বাধিক আত্মহত্যা করে থাকে, সাম্প্রকিকালে আমরা কয়েকজন নারী যারা তারকা বলে পরিচিত তাদেরও আত্যাহুতি দিতে দেখেছি। কিন্তু কেন তোদের এই নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, একি কেবলই অভিমান? নাকি সমাজ ব্যবস্থা, পুরুষ-তান্ত্রিকতা, নারীর মনস্তত্ত্ব অথবা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট কোন উপাদান আত্মহত্যার জন্য দায়ী। এবং আমাদের প্রত্যাশা, পাঠকরাও ব্যাপকভাবে মতামত প্রকাশ এবং অভিজ্ঞতা লিখে সহায়তা করতে পারবেন এ বিষয়ে যাতে আলোচনাটি বিজ্ঞানসম্মত হয়।

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? এ প্রশ্নটি এখন পর্যন্ত রহস্যাবৃত যার সুনির্দিষ্ট উত্তর কিংবা সমাধান আমাদের হাতে নেই। মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসা শাস্ত্রবিদরা এ বিষয়ে নানা মত প্রদান করেছেন যা একটি একমুখী ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। বরং প্রতিটি বিজ্ঞানই যেন তার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে। ফলে, শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে সহজ সিদ্ধান্তে উপনিত না হয়ে আরও জটিলতায় নিমগ্ন হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমি এখানে আত্মহত্যার তাত্ত্বিক বিষয়ে আলোচনা করব যাতে তারা পরবর্তীতে সমস্যাটির প্রকরণ

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা লুকিয়ে আছে তবে ব্যক্তি ভিন্নতায় মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এ ধরনের মাত্রা কোন ভাবেই পরিমাপযোগ্য নয়। তবে ব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা তার মধ্যে শিশুকালেই প্রবিষ্ট হয়। এর জন্য দায়ী ভীতি, দুশ্চিন্তা, হতাশা, পারিবারিক পরিবেশে দেখা ভালোবাসা ও সংঘাত, যৌন শিক্ষার অভাব, সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া, অতিমাত্রায় নির্ভরতা ইত্যাদি

নিয়ে সহজেই বুঝতে পারে। এ বিষয়ে প্রথমেই এমিল ডুর্খিম রচিত বই Suicide: A Study in Sociology নামক বইয়ে যে আলোচনাটি করেছেন তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা এখানে উপস্থাপন করছি যা আত্মহত্যার মতো বিষয়ের তাত্ত্বিক জটিলতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে। তাছাড়া তিনিই প্রথম আত্মহত্যা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তার মতে আত্মহত্যা হলো তিন প্রকার। এগুলো হলো, আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা, পরার্থপর আত্মহত্যা ও নৈরাজ্যজনক আত্মহত্যা।

আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা

সহজ কথায় ব্যক্তি যখন নিজের কারণে আত্মহত্যা করে তখন তাকে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলে। আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার জন্য সমাজে সংহতির অভাবকেই ডুর্খিম দায়ী করেছেন। তাছাড়া অতিমাত্রায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কারণ বলে তার অভিমত।

পরার্থপর আত্মহত্যা

(Altruistic Suicide) : সমাজের সঙ্গে অতি সংগতি কিংবা রাষ্ট্রীয় কারণে ব্যক্তি যখন আত্মাহুতি দেয় তখন তাকে ডুর্খিম পরার্থপর আত্মহত্যা বলেছেন। পরার্থপর আত্মহত্যার জন্য তিনি সমাজের কঠোর নিয়ম-কানুনকে দায়ী করেছেন।

নৈরাজ্যজনক আত্মহত্যা

(Anomic Suicide) : নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা নিয়ে বলতে গিয়ে সমাজে নিয়ম-কানুনের অভাবকেই তিনি দায়ী করেছেন। যখন সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস এবং আচরণগুলো ভেঙে পড়ে তখন সমাজে নৈরাজ্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ব্যক্তিকে আত্মহত্যা প্রবণ করে তোলে। এবং যে ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে তাকে নৈরাজ্যজনক আত্মহত্যা বলে। বিশেষ করে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ব্যক্তিকে এমন কাজে বাধ্য করে। এ বিষয়ে আমি সিগমন্য ফ্রয়েডের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি যা আত্মহত্যাকে আরও রহস্যময় করেছে। ১৮৯৮ সালে ভিয়েনাতে আত্মহত্যা বিষয়ক যে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ফ্রয়েড তার বক্তব্যে বলেছিলেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সত্ত্বেও আত্মহত্যা বিষয়ে আমরা কোন নিশ্চিত উপসংহারে পৌছাতে পারিনি, এবং আমাদেরকে এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে যতক্ষণ না এমন অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে যা এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। যেমন, জিলবুর্গ আত্মহত্যা সম্পর্কে বলেছেন যে, 'আত্মহত্যা হচ্ছে মানব জাতির মতোই প্রাচীন। এবং এটা সম্ভবত হত্যা এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর মতোই পুরনো। অবশ্য তিনি এও বলেছেন, এটা নিশ্চিত যে, আত্মহত্যার মতো সমস্যার কোন বিজ্ঞানভিত্তিক

ব্যাখ্যা নেই। এমনকি সাধারণ ধারণা কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়েও এটার কার্যকরণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি কোন বাস্তবসম্মত সমাধান বাতলানো।

মনস্তত্ত্ব (Psychiatry) অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আত্মহত্যা প্রবণতা লুকিয়ে আছে তবে ব্যক্তি ভিন্নতায় মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এ ধরনের মাত্রা কোন ভাবেই পরিমাপযোগ্য নয়। তবে ব্যক্তির মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা তার মধ্যে শিশুকালেই প্রবিষ্ট হয়। এর জন্য দায়ী ভীতি, দুশ্চিন্তা, হতাশা, পারিবারিক পরিবেশে দেখা ভালোবাসা ও সংঘাত, যৌন শিক্ষার অভাব, সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া, অতিমাত্রায় নির্ভরতা ইত্যাদি। এবং এ আলোচনার মাধ্যমে এ কথা বলা যায়, আত্মহত্যা আসলেই রহস্যমন্ডিত এবং এর ব্যাখ্যা প্রদান সহজ বিষয় নয়। তবু আমরা চেষ্টা করব, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় এ সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে। বিশেষ করে বাংলাদেশে যে ব্যাপক আত্মহত্যা সংঘটিত হচ্ছে তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করাই হবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

নারীর আত্মহত্যা : জেন্ডার সমস্যা

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি বলেছি যে, বাংলাদেশে ব্যাপক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। এবং বাংলাদেশের মতে সমাজে নারীরাই সর্বাধিক আত্মহত্যা করে; যা প্রায় ৮৫%-এর উপর। বিশ্বময় যখন নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা অধিকারের কথা হচ্ছে তখন সবার সামনেই বাধাহীনভাবে নারীর এই আত্মবিনাসকে আমরা চোখ বন্ধ করে উপভোগ করছি, এই বলে যে, ব্যাপারটা একান্তই নারীর ব্যক্তিগত। প্রশ্ন হচ্ছে নারীর এই বিন্যাস কি তার স্বেচ্চাকৃত না-কি সমাজ তাকে বাধ্য করছে চলমান দৃশ্যপট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে। আর এখানেই রয়েছে নারীর- আত্মহত্যার কোন জেন্ডার পারসপেকটিভ কি-না তা জানার। বিভিন্ন পঠন-পাঠন থেকে আমরা বুঝতে পারি, আত্মহত্যা একটা 'জেন্ডার সমস্যা' যা নারীর আত্মহননের ভিন্ন ব্যাখ্যা দাবি করে। যদিও আমরা এর আগে বিষয়টির নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণ দিয়েছি, তবুও এ সমস্যাটিকে 'জেন্ডার লেন্স' দিয়ে বিশ্লেষণ জরুরি। যেহেতু অধিকাংশ আত্মহত্যাকারীই নারী তাই-এর একটা বাড়তি গুরুত্ব আছে।

এবিষয়ে এমিল ডুর্খিম রচিত বই Suicide: A study in sociology-থেকে পূর্বে আমি যে আলোচনাটি করেছি তা প্রণিধানযোগ্য। আসলে ডুর্খিমের আলোচনা থেকে বাংলাদেশে নারীরা কেন অধিকহারে আত্মহত্যা করে সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি নিজে বাংলাদেশের আত্মহত্যা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে, নারীর আত্মহত্যা একটি জেন্ডার এবং তার ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এখানে বলে নেয়া ভালো, আমার ধারণা মতে, 'আত্মহত্যা' কত প্রকার তা আবিষ্কৃত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে এবং কীভাবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সেটি আবিষ্কৃত হওয়া। আগেই আমরা ডুর্খিমের তত্ত্ব আলোচনায় দেখেছি, আত্মহত্যাকে তিনি তিন প্রকার বলেছেন, যথা: ১. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (Egoistic Suicide) ২. পরার্থপর আত্মহত্যা (Altruistic Suicide) ও ৩. নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (Anomic Suicide)। সহজ কথায়, ব্যক্তি যখন নিজের কারণে আত্মহত্যা করে তখন তাকে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলে। যখন অন্যের কারণে নিজেকে উসর্গ করে তখন তাকে পরার্থপর আত্মহত্যা বলে। আর যখন সমাজে বিদ্যমান নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির কারণে আত্মহত্যা করে তখন তাকে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা বলে। এবং ডুর্খিমের মত অনুযায়ী, এসব আত্মহত্যার পিছনে মূল কারণ হলো 'সামাজিক সংহতির অভাব'। আমি মনে করি, 'সামাজিক সংহতির অভাব' এ তথ্যটুকু আমাদের নারীর আত্মহত্যার প্রেক্ষিত বুঝতে সহায়তা করবে। এবং আমাদের সমাজে নারীর অবস্থান এবং আত্মিকরণ (assimilation) কিংবা জেন্ডার পার্থক্যকরণ (differenciation) তাকে কতটা প্রান্তিক-মানবে রূপান্তরিত করছে, তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। বিষয়টি বোঝার জন্য আমি নারীর আত্মহত্যার কিছু চিত্র উপস্থাপন করছি; যা পাঠককে বিষয়টির গভীর বুঝতে সহায়তা করবে।

এখন পাঠকের সুবিধার জন্য আমি ২০১১ সালের আত্মহত্যার কিছু চিত্র তুলে ধরছি যা বিভিন্ন দৈনিক থেকে সংগ্রহ করা-

ক. নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ চরকিশোরগঞ্জের চরহোগলা গ্রামের ইসমত আরা (২৮), ৭ বছরের শিশুসন্তানসহ স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে।

খ. হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আউশকান্দি ইউনিয়নের বেতাপুর গ্রামের পারুল আক্তার (১৭) ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

গ. বগুড়া সদরের শীলা খাতুন বাবা-মায়ের ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

খবরগুলো ৭ জুলাই ২০১১, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়।

মাদারীপুর সদর উপজেলায় শিরিন আক্তার। দাখিল মাদ্রাসার ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। ইউপি মেম্বারের সালিসে অপমান সইতে না পেরে ঘরের আড়ার সঙ্গে দড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। খবরটি ২১ আগস্ট ২০১১ দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়।

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের ফেরদৌসী মাতব্বরদের দেয়া অপবাদ সইতে না পেরে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ৪ সন্তানকে জড়িয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেন। সংবাদটি ১৯ আগষ্ট ২০১১ আমার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়।
আখাউড়া গৃহবধু ভগবতী দাস দুই সন্তান নিয়ে পারিবারিক কলহের জেরে কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করে। একই পত্রিকায় ৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তে ছাপা হয়।

ঢাকার মোহাম্মদপুরের রিবিতা (১৪) ভিকারুন্নেছা নুন কলেজের ছাত্রী, বাবা-মার সঙ্গে কলহ করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। সংবাদটি দৈনিক ডেসটিনিতে ১০ অক্টোবর ২০১১ তে ছাপা হয়। এসব নারীদের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি, 'স্বামীর সঙ্গে অভিমান, বাবা-মায়ের উপর অভিমান, অপবাদ, সালিসে অপমান, পারিবারিক কলহ, ইত্যাদি। অর্থাৎ এসব নারীর আত্মহত্যার জন্য অপবাদ, স্বামীর অত্যাচার, সামাজিক সালিস, বাবা-মার শাস্তি, বাবা-মার কলহ' ইত্যাদি এখানে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া অন্য এক গবেষণায় আত্মহত্যার চিহ্নিত কারণগুলো ছিল, পারিবারিক কলহ, দরিদ্রতা, যৌতুক, বিবাহ পূর্ব প্রেম, স্বামীর পরনারী আসক্তি, পর পুরুষের সঙ্গে মা'র সম্পর্ক, অর্থ লোকসান, স্ত্রীর পরকীয় ইত্যাদি।

অর্থাৎ সমাজ কিংবা পরিবার সর্বক্ষেত্র থেকেই আত্মহত্যাকারী এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছে। যা তাকে এক প্রকার অসহায়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে একবারে সমাজের 'প্রান্তে' এসে উপনিত হয় যেখানে সে প্রকৃতই 'বিচ্ছিন্ন জীব'। ডুর্খিম যাকে বলেছেন, 'সংহতির অভাব'। বাংলাদেশে ইদানীং বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করেছে; বিশেষ করে নগর এলাকায়। সেখানে সমাজের নিজস্ব কোন ভাষা নেই, নেই কোন দায়িত্ববোধ; চোখ থাকলেও কেউ কাউকে দেখে না। এ যেন আমাদের চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির একেবারে ভিন্ন চিত্র। সমাজের গাঁথুনি শিথিল হয়ে পড়েছে, 'সামাজিক কণ্ঠস্বর' বলে যা ছিল তা হয়ত এখন কেই জানেই না, কারণ তা উচ্চারিত হয় না। 'চিরায়ত বাঙালিত্ব' আর 'রফতানিকৃত ইউরোপীয় সংস্কৃতি'-এ দুয়ের মধ্যে প্রকৃত অর্থে যে সাংস্কৃতিকীকরণ (acculturation) হওয়ার কথা তা আসলে এখনও হয়নি। ফলে, আমরা শাশ্বত বাঙালিত্বের যে উদারতা তা ছেড়ে হয়ে পড়েছি বড্ড আত্মকেন্দ্রিক যা অপর মানুষের দুঃখ, ব্যথা জানার দায়িত্ব বা কর্তব্য যাই বলি না কেন তা থেকে করেছে আমাদের বিমুখ। এখন স্বামী, স্ত্রীর খোঁজ রাখে না, পিতা- সন্তানের ভালো-মন্দ জানে না; এমন সমাজে পারিবারিক বাঁধন একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর এই ছোট ছোট সব-সম্পর্কের অভাব আমাদের সমাজে আত্মহ্যার জন্য দায়ী। সমাজ অর্থ যদি

‘সহযোগিতা’ হয়ে থাকে; তাহলে সমাজ বিজ্ঞানে পঠিত ‘সমাজের’ ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞা নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে। কারণ আমাদের দেশে ওসব ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে; সমাজের বাঁধন শক্ত হওয়া বড় দরকার। ‘মানুষ মানুষের জন্য’ কেবল মুখে বললেই হবে না; দরকার তার প্রতিফলন। ইরানের কবি নাজিম হিকমত বলেছিলেন, ‘বিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোক বড় জোর এক বছর’। প্রকৃতই বর্তমানে মানুষ তার পিতা-মাতার মৃত্যুর দিন ভুলে যায়। সে কারণেই লক্ষ্য করা গেছে, সন্তান বাবা-মার উপর অভিমান করে নিজের বিনাস ঘটায়। এইসব কারণগুলো যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে এর মূলে রয়েছে তিনটি কারণ; যথা ১. নারীর দরিদ্রতা ২. নারীর অন্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং ৩. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। আমি পূর্বেই বলেছি, ডুর্খিম তার তত্ত্বে, নারীর মধ্যে আত্মহত্যার ঝোঁক সব থেকে কম বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের মতে সমাজে দেখা যাচ্ছে, এর উল্টোটা। আর গবেষণার এই সীমাবদ্ধতা থেকেই বাংলাদেশের আত্মহত্যাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এবং ইতোমধ্যে গবেষণাকৃত সত্য হলো, বাংলাদেশে, এ অপরাধের মূল কারণ হলো- ‘অর্থনৈতিক দরিদ্রতা’। এমনকি পুরুষের উপর নারীর যে নির্ভরশীলতা তাও পরিবারের মধ্যে তাদের ‘দরিদ্রতা এবং অর্থনৈতিক অসহায়তা থেকে উদ্ভুত’। দেখা যায়, ধনী পরিবারের মেয়েরাও এক অর্থে দরিদ্রের কারণে তাদের হাতে অর্থ নেই যা তার মধ্যে ‘অসহায়তা এবং নিরাপত্তাহীনতা’ দুই আরোপ করে।

জেন্ডার পারসপেকটিভের মূল প্রতিপাদ্য হলো- সামাজিকীকরণে মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্যকরণ যা তার মনে হীনমণ্যতার জন্ম দেয়। প্রতিটি ঘটনার পিছনেই ‘সমাজ মনষ্কতা’ এক ধরণের কারণ যা ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় সে আসলে কেমন আচরণ করবে। আমাদের সমাজে লক্ষ্য করা যায়, নারীর প্রতি ব্যক্তির যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তা সে অর্জন করেছে সমাজ ঐতিহ্য থেকে; যা প্রচন্ড পুরুষ কেন্দ্রিক। ফলে, পুত্র-সন্তান-কন্যা সন্তানের থেকে অধিক কাম্য হয়েছে। এমনকি ‘কন্যা লালনকে অন্যের গাছে পানি ঢালার’ সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

পরিবারের মধ্যে লালিত হওয়ার সময় একজন বোন লক্ষ্য করেছে তার ভাই বেশি সুবিধা পাচ্ছে সব ক্ষেত্রে, ‘পোশাক থেকে শুরু করে খাবার- এ পর্যন্ত’। যা মেয়েটির মধ্যে একটা হীনমন্যতা তৈরি করে দিয়েছে। যখন যেস স্বামীর সংসারে যায় তখন এ অবস্থা আরও প্রকট আকার ধারণ করে, সে শিকার হয় সব রকমের বৈষম্যের, এমনকি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনেরও। যার মূল কারণ, সে নারী।

যা নিশ্চিতভাবেই ‘জেন্ডার বৈষম্য’; কারণ শুধু নারী হওয়ার জন্যই তার এই পরিণতি। আর এ বৈষম্য তাকে জীবনের প্রান্তে ঠেলে দেয়; তার সামনে আর কোন পথই খোলা থাকে না। একমাত্র ‘নিজেকে বিলিয়ে’ দেয়া ছাড়া- যার নিশ্চিত পরিণতি আত্মহত্যা।

আত্মহত্যার সামগ্রিক আলোচনা শেষে আমি কিছু ‘নিয়ামক বা ঝুঁকি’ চিহ্নিত করেছি যার কারণে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে চায়। আমার পূর্ববর্তী আলোচনার একটা নিষয় নিশ্চিত করেছে নানা কারণ আত্মহত্যার জন্য কাজ করে। এক্ষেত্রে একটি একরৈখিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা খুব কঠিন বৈকি। যেসব ফ্যাক্টরগুলো ব্যক্তিকে আত্মহত্যার জন্য তাড়িত করে তার কতকগুলো কারণ এখানে উপস্থাপিত করা হলো।

- **মানসিক অসুস্থতা :** কোন ব্যক্তির মানসিক অবস্থা জানা সব থেকে কঠিন; কিছুটা রহস্যময়ও বৈকি। ব্যক্তির মনোজগতে যদি গড়মিল দেখা দেয় তাহলে তার জন্য আত্মহত্যাপ্রবণ হওয়া খুব সম্ভব।

- **সামাজিক বিচ্ছন্নতা :** ব্যক্তি যদি সামাজিক ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে তাহলে আত্মহত্যার ঝুঁকি রয়েছে বলতে হবে।

- **ব্যক্তির একাকিত্ব :** এ বিষয়টি বেশ জটিল। যেমন, কোন ব্যক্তি অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও একাকিত্বে ভুগতে পারে। আবার সংগিহীন অবস্থায় ব্যক্তির যে একাকিত্ব তা দৃশ্যমান। এ দুটি অবস্থায় যে ব্যক্তি বসবাস করে সে আত্মহত্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলতে হবে। এবং আমার বিবেচনায় ঝুঁকিটা বেশ তীব্র।

- **মানসিকভাবে নির্যাতিত :** কোন ব্যক্তি যদি কারও দ্বারা মানসিক অবদমনের শিকার হয় তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তির পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব। এবং সে অবদমন যদি হয় ‘প্রতিবাদহীণ’ তাহলে আত্মহত্যার ঝুঁকি অনেক বেশি বলে প্রতীয়মান হবে।

- **মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া :** অকস্মাৎ প্রাকৃতি দুর্যোগ, হঠাৎ প্রিয়জন হারানো কিংবা ব্যাপক অর্থ লোকসান হলে ব্যক্তির পক্ষে আত্মহত্যা হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়টি টিন-এজারদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

- **রোগ যন্ত্রণা :** যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণায় ভুগছেন, তার এমন মতে হতে পারে , তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যাই শ্রেয়। এমনকি ইতোমধ্যে কিছু দেশ রোগমুক্তির জন্য আত্মহত্যাকে বৈধ বলে আইন পাস করেছে। যেমন, হল্যান্ড এ সংক্রান্ত আইন পাস করেছে।
- **পূর্বে আত্মহত্যা করতে গিয়ে যে ব্যর্থ হয়েছে :** যে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে, সে ব্যক্তি আত্মহত্যার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এবং তার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব।
- **যেসব পরিবারে আত্মহত্যার রেকর্ড রয়েছে :** এমন পরিবার যেখানে আত্মহত্যা করার ঐতিহ্য রয়েছে সে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ডুর্খীমও এমন পরিবারে আত্মহত্যার কথা বলেছেন।
- **নেশাগ্রস্ততা :** ব্যাপক নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ আত্মহত্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। তবে আমাদের মতো সমাজে 'নেশা'র প্রভাব কম। পাশ্চাত্য সমাজে এর তীব্রতা খুব বেশি বলে বিবেচিত হয়।

এখন দেখা দরকার ব্যক্তির আত্মহত্যা করার যে ইচ্ছা, তার কোন লক্ষণ বোঝা যায় কিনা। মনোবিদ, চিকিৎসাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী সবায় মনে করে আত্মহত্যার পূর্বে ব্যক্তি এমন কিছু আচরণ করে যা দ্বারা বোঝা যায় ব্যক্তিটি আত্মহত্যা করতে পারে। এ ধরনের আচরণকে 'সুইসাইড ওয়ার্নিং' বলে। এসব লক্ষণ দেখে মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা বোঝা যায়।

- **সুইসাইড ওয়ার্নিং আত্মহত্যার হুমকি দেয়া:** যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে বলে প্রয়াশ : হুমকি দেয়।
- **ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়া :** যখন কোন ব্যক্তি বলে, তার বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই।
- **নিকটজনদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া :** যখন কোন ব্যক্তি নিকটজনদের কাছ থেকে নানা কৌশলে বিদায় নিতে থাকে। যেমন বলতে থাকে, 'আমাকে মাফ করে দিও; যদি অন্যায় করি কিছু মনে করোনা' ইত্যাদি।
- **নিজের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা :** যখন কোন ব্যক্তি বলে, 'সে একজন খারাপ মানুষ, কারও জন্য কিছু করতে পারলাম না' ইত্যাদি।
- **মৃত্যু নিয়ে গল্প বা কবিতা লেখা :** বিশেষ করে টিন-এজাররা যখন মৃত্যু নিয়ে গল্প বা দেয়াল লিখন করে।
- **অকস্মাৎ আচরণের পরিবর্তন হওয়া :** যদি হঠাৎ কারও আচরণের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়।

- **আত্মহত্যার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হাতের কাছে রাখা :** যদি কোন ব্যক্তি যথেষ্ট পরিমাণ ঘুমের বড়ি ক্রয় করে কিংবা কীটনাশক লুকিয়ে রাখে তাহলে বিষয়গুলোকে আত্মহত্যার প্রস্তুতি হিসাবে বিবেচনা করে।

আত্মহত্যার প্রতিরোধ কৌশল

আলোচনাটি শুরু করব ভল্টেয়ারের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। ভল্টেয়ার বলেছিলেন, 'যে ব্যাক্তি মানসিক অবস্থার কারণে নিজের জীবন বিসর্জন দেয় : সে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলে হয়তো বেঁচে থাকতে আগ্রহী হতো'। আমাদের মতো সমাজে আত্মহত্যা এখনও সামাজিক হিসেবে স্বীকৃত নয়। আর এজন্য কোন প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। তবে, পৃথিবীর বহু দেশে আত্মহত্যা-প্রতিরোধ-কেন্দ্র রয়েছে। এবং সেসব কেন্দ্র থেকে সাহায্যপ্রার্থীদের নানা ধরনের সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট আত্মহত্যা গবেষক ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তার 'আত্মহত্যার আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ' গ্রন্থে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাক তার উপর ভিত্তি করে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। পদক্ষেপগুলো হলো- এসব কেন্দ্রগুলো আত্মহত্যাপ্রবণ লোকেদের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ও তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে; কেন্দ্রগুলো সমস্যা চিহ্নিত ও সমস্যার মূল কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করে; কেন্দ্রগুলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মহত্যা করার যে প্রবণতা তা হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালায়; পরামর্শ কেন্দ্রগুলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সবল ও দুর্বল দিকগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে। তবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন হওয়ায় আমি মনে করি এখানে আত্মহত্যা প্রতিরোধের জন্য কাঠামোগত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এবং এক্ষেত্রে প্রথমে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানত : তিন ধরনের ব্যবস্থার আওতায় পদক্ষেপগুলো গৃহীত হওয়া দরকার। এগুলো হলোঃ

- **পদক্ষেপ-১ :** বাংলাদেশ জাতীয় আত্মহত্যা প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন।
  কার্যক্রম : বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করা; অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে নীতিমালা প্রণয়ন করা।

- **পদক্ষেপ- ২ :** আত্মহত্যা প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন।
  কার্যক্রমঃ হাসপাতালে আত্মহত্যা প্রচেষ্টাকারীদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য 'সেল' স্থাপন করা; হাসপাতালে কাউন্সিলিং ডেস্ক স্থাপন করা; শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে কাউন্সিলিং ডেক্স স্থাপন করা; টোল-ফ্রি সহায়ক ফোন লাইন প্রবর্তন করা;

- **পদক্ষেপ-৩ :** আত্মহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতন কার্যক্রম স্থাপন।

কার্যক্রম : জনগণকে সম্পৃক্ত করে সভা সেমিনার করা; ক্যাম্পেইন, অ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম করা; শিক্ষা কারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা; জাতীয়ভাবে 'আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ' দিবস পালন করা (৮ সেপ্টেম্বর); প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার তৈরি করা; অ্যাকশন রিসার্চ করা; স্থানীয় সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে সম্পৃক্ত করা; মিডিয়ায় ' আত্মহত্যা' না-করা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা; ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের 'রেজিলিয়েন্স' বৃদ্ধি করা যাতে তারা আত্মহত্যা প্রতিরোধ সক্ষম হয়। মনে রাখতে হবে আত্মহত্যা হচ্ছে 'হিউম্যান ডিজাস্টারের' অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ব্যক্তির যে দুর্বল অবস্থান কিংবা সমাজ-বিচ্ছিন্নতা যা তাকে মানসিক অবসাদে নিমজ্জিত করে তার মূলে রয়েছে 'সমাজ বা পরিবার'। তাই সমাজ, গোষ্ঠী, পরিবারের যে 'মানব বিপর্যয় প্রতিরোদ ক্ষমতা' তা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন একই সঙ্গে মাইক্রো ও ম্যাক্রো লেভেলে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাহলে হয়তো আমাদের সমাজে আত্মহত্যার যে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা তা শ্রীঘ্রই হ্রাস পাবে।

[দৈনিক সংবাদ, তারিখ: ০৮/০৯/২০১৩ইং, তারিখ: ১৫/০৯/২০১৩ইং, তারিখ: ২২/০৯/২০১৩ইং, তারিখ: ২৯/০৯/২০১৩ইং, তারিখ: ০৬/১০/২০১৩ইং]

আত্মঘাতী হামলা বিশ্লেষণে গোঁজামিল তত্ত্ব

ইদানীং আত্মহত্যার নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় জানতে কিংবা শুনতে হচ্ছে, বিশেষ করে টিভি টকশোগুলোয় কিংবা কখনো কখনো দৈনিক পত্রিকায়। বিশেষ করে আমাদের দেশে নিকট অতীতে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়েছে বলে দাবি করা হলে এ নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ শুরু হলো। এবং ভীষণভাবে হতাশ হতে হলো এটা লক্ষ করে যে, টকশো বা দৈনিক পত্রিকায় যে বিশ্লেষণ করা হলো, তা আসলে ভীষণভাবে গোলমেলে- যাকে সোজা কথায় বলে গোঁজামিল তত্ত্ব। এর মাধ্যমে দুই ধরণের দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পেল: প্রথমত. যারা রাত জেগে টকশো দেখেন, তারা আত্মহত্যা কিংবা আত্মঘাতী বোমা হামলার বিশ্লেষণ থেকে অর্ধসত্য কিংবা ভুল ব্যাখ্যাকে ঠিক বলে জানলেন। দ্বিতীয়টি আরো গুরুতর, জনগণকে ভুল তথ্য দিয়ে সমাজে মিথ্যের একটি আবহ তৈরী করা হলো- য কেবল দায়িত্বহীনতাই নয়, অতি অবশ্যই অপরাধও বটে। এক্ষেত্রে মিডিয়ার কান্ডজ্ঞানহীন আচরণও বিবেচনায় নেয়ার মতো। যেমন- কোনো ঘটনা ঘটলে সে রাতেই আলোচনা করা দরকার এবং যেকোনো ব্যক্তিকে দিয়েই হোক, তার সে বিষয়ে কোনো একাডেমিক পঠন-পাঠন থাক বা না থাক। এখন দেখা দরকার শিরোনামকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কী বলছে।

প্রথমেই যেটা জানা দরকার তা হলো, এ ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি পরম্পরাগত সম্পর্ক আছে। প্রাক-ইতিহাসে সীতার ধরিত্রীর মাঝে আত্মবিলীন হওয়া কিংবা রামের সপরিবারে সরযু নদীতে আত্মাহুতি দেয়া উপমহাদেশীয় লোককথার প্রথম আলোচিত ঘটনা। দুটি বিষয়ের সঙ্গেই আত্মসম্মান ও লোকরঞ্জন জড়িত। আত্মহত্যার পরবর্তী ঘটনাগুলোও ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক অবদান, তা হলো- স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণ; যা 'সতীদাহ' নামে ধর্মেও মোড়কে বিকশিত হয়েছিল। এ পর্যন্ত আত্মহত্যাকে সামাজিক ব্যাধি বা ধর্মীয় আচরণের পরিণাম বলা যায়। তবে আত্মহত্যা নিয়ে যিনি প্রথম গবেষণা করেছিলেন, তিনি ফরাসি সমাজ দার্শনিক এমিল ডুর্খিম। তার মতে আত্মহত্যার তিনটি প্রকরণ, এগুলো হলো- 'আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা, পরার্থপর আত্মহত্যা এবং নৈরাজ্যজনক আত্মত্যা'। এসব আত্মহত্যাকে তিনি 'সামাজিক ঘটনা' বলে অভিহিত করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে ডুর্খিমের আত্মহত্যা-বিষয়ক গবেষণা ছিল আঠারো শতকে এবং ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে। তাছাড়া তখনো আত্মহত্যার রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি। যেমন- নিজের গায়ে বোমা বেধে নিজেকে উৎসর্গ করা কিংবা প্লেন হাইজ্যাক করে উড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। ফলে 'আত্মঘাতী বোমা' হামলার কোনো বিশ্লেষণ তা বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুইসাইড এ স্টাডি ইন সোসিওলজি'-তে নেই। এখন প্রশ্ন হলো, মহান

ক্ষুদিরাম এবং বিনয়, বাদল ও দিনেশের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আত্মাহুতি দেয়া কি নিছকই সামাজিক ঘটনা? নাকি এর রয়েছে ভিন্ন সমাজ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ? কিংবা শ্রীলংকার তামিল টাইগারদের ব্যাপক আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার, ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের খালি স্থান আন্দোলনকারীদের বিমান হাইজ্যাক, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মিদের (আইআরএ) অনশনের মাধ্যমে আত্মহত্যা (গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে)- এসব ঘটনার ব্যাখ্যা কী? এসবের সঙ্গে আল কায়েদা বা ইসলামী উগ্রবাদীদের আত্মঘাতী বোমা হামলার বিশ্লেষণ কি একই হবে? একি কেবল শহীদ হওয়ার কৌশল, যা কেবল বেহেশত নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছে। ঘটনার প্রকরণ অনুযায়ী, এগুলোর মধ্যে কৌশলগতভাবে পরম্পরাগত সম্পর্ক রয়েছে। তবে এসব আত্মহত্যার 'কারণতত্ত্ব' ব্যাখ্যা খুব সহজ নয়, যা বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক কিংবা প্রিন্ট মিডিয়ায় সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

যদি ধরেই নেয়া হয়, ডুর্খিমের পরার্থপর আত্মহত্যার সঙ্গে এসবের মিল রয়েছে, তাহলে তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ডুর্খিম বলেছিলেন, অন্যের জন্য যেমন- সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও ধর্মের কারণে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে পারে। তবে আমার মতে, তা দুর্বলতর ব্যাখ্যা, যা দিয়ে আন্তর্জাতিক বোমা হামলা কিংবা প্লেন উড়িয়ে দেয়াকে ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। যদিও তিনি 'সৈনিকদের আত্মহত্যাকে' আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ বলেছিলেন। তাহলে কি আমরা বলতে পারি, যারা নিজের গায়ে বোমা মেরে আত্মহত্যা করেছে, সেটাও আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা? আর কেউ যখন নিজের দেশের জন্য এবং কেউ যখন ধর্মের নামে আত্মহত্যা করছে- এ দুটোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এর পেছনের কারণ কি এক হতে পারে? বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা দরকার। আর সেজন্য প্রয়োজন আত্মহত্যা বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা।

এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো, আত্মঘাতী বোমা হামলার বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করা। একটু ইতিহাসের আশ্রয় নিলে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রথম আত্মঘাতী বোমা হামলা যিনি করেছিলেন, তার নাম 'গ্রিনেভেটস্কি'- একজন রাশান, যিনি জারকে হত্যার জন্য নিজে এ কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'পিপলস উইল' নামক বাম সংগঠনের একজন সদস্য, তার অর্থ হচ্ছে- আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রথম পরিকল্পনা ছিল বামদের মস্তিষ্কপ্রসূত। আর ১৮৮১ সালের ১৩ মার্চ প্রথম আত্মঘাতী বোমা হামলা সংঘটিত হয়। অন্তত এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, 'গ্রিনেভেটস্কি' হচ্ছেন প্রথম ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত 'সুইসাইড বোম্বার'। শুরুটা এমন হলেও কেবল ১৯৮১

থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে ২১ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে, যেখানে ৩৪টি দেশ আক্রান্ত হয়েছিল।

নানা রকম গবেষণা হয়েছে এর কারণ নির্ণয়ের জন্য, সে তালিকায় ডুর্খিম থেকে রিয়াজ হাসান পর্যন্ত বেশ আলোচিত। এক্ষেত্রে রিয়াজ হাসানের 'লাইফ এজ এ উইপোন' (রাউটলেজ, ২০১১) গ্রন্থটি কারো কারো নজর কেড়েছে। আত্মঘাতী বোমা হামলার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে হাসান মূলত একাধিক বিষয়কে দায়ী করেছেন। এগুলো হলো- 'সম্প্রদায়, রাজনীতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম, আত্মসম্মানবোধ, অধীনতা গ্রহণের অস্বীকৃতি, প্রতিশোধ ও বিচ্যুত আচরণ।'

কিন্তু যে বিষয়টি এখানে উপেক্ষিত তা হলো- 'ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া'; আমার মতে, যা আত্মঘাতী বোমা হামলার প্রধান কারণ হতে পারে। আত্মঘাতী বোমা হামলার নানা প্রেক্ষাপট রয়েছে, যখন একজন ফিলিস্তিনি বোমা মেরে ইসরায়েলি সৈন্যকে ধ্বংস করে, তখন তা আন্তর্জাতিক কালো রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা তা মাতৃভূমি দখলদারির বিরুদ্ধাচরণ; কিন্তু যখন একজন মধ্যপ্রাচের মুসলমান (আইএস ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে) আত্মঘাতী বোমা হামলা করে, তার অর্থ- পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং একই সঙ্গে প্রতিরোধও বৈকি। যেটি লক্ষ করা গিয়েছিল তামিল টাইগারদের ক্ষেত্রে। স্বাধীন তামিল ভূমির জন্য তারা সুসংগঠিত লংকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাধিক আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছিল। এমনকি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা করতে যে নারী স্কোয়াড আত্মহুতি দিয়েছিল, তার কারণ ছিল ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক তামিল নারীদের ধর্ষণের প্রতিবাদ (ভারতীয় সৈন্যরা আশির দশকে শ্রীলংকায় অনুপ্রবেশ করেছিল)। রাজীব গান্ধীর হত্যা ছিল মূলত শ্রীলংকায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ এবং তামিল নারীদের ধর্ষণের তীব্রতম প্রতিবাদ। এ ঘটনাগুলো হচ্ছে মূলত একটি অন্যায্য সিদ্ধান্ত কিংবা কর্ম যা-ই বলি না কেন তার প্রতিবাদ। আর যখন কোনো দেশ বা শক্তির বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ও স্বীকৃত প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ হয় অথবা করার ক্ষমতা থাকে না কিন্তু ন্যায্য প্রতিবাদ করার প্রয়োজন, তখনই একটি গোষ্ঠী বা জাতি আত্মঘাতী বোমা হামলা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে কারণে বলছিলাম, এসব ঘটনা হলো মূলত অন্যায় ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া- যা আরেকটি অন্যায্য আচরণের জন্ম দেয়।

এবার একটি ভিন্ন রকম উদাহরণ দিয়ে আলোচনা শেষ করব। তা হল- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি 'কামিকাজী' সৈন্যদের আত্মঘাতী বোমা হামলা: যাদের সবাই ছিলেন পাইলট। আমেরিকান নেভিদের আক্রমণে ৩ হাজার ৮৬০ জন কামিকাজি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে অনেক নারী পাইলটও ছিলেন। নিশ্চয়ই এতক্ষণে এটা পরিষ্কার যে, কেউ সখ করে গায়ে বোমা বেঁধে বা প্লেন নিয়ে অন্যকে আক্রমণ করে নিজেকে হত্যা করে না। এর পেছনে যে সমাজ-মনোজাগতিক ব্যাখ্যা রয়েছে, তা যথেষ্ট জটিল। তবে এটুকু বলতে পারি, বাংলাদেশের তথাকথিত টকশো জ্ঞানীরা আত্মঘাতী বোমা হামলা যে ব্যাখ্যা করেন, তা মূলত বর্তমানে পশ্চিমা শক্তির নির্দেশিত কথারই অনুরণন, যেখানে না আছে বিশ্লেষণ কিংবা চিন্তার গভীরতা, এমনকি দেশজ ভাবনা। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের 'ভাবনাজগৎ কিংবা ভাবনা করার প্রক্রিয়া হাইজ্যাকড় হয়ে গেছে', যেখানে এশীয় 'ভাবনা করার প্রক্রিয়া' হোঁচট খেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই যিনিই আত্মঘাতী বোমা হামলা করেন, তিনিই সন্ত্রাসী- এটি এখন সবচেয়ে সস্তা ব্যাখ্যা। তাহলে দুনিয়াময় যত দেশপ্রেমিক আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।

[দৈনিক বণিক বার্তা, তারিখ: ২৪/০২/২০১৭ইং]

এলোমেলো ভাবনা

১. শেয়ারবাজারে দরপতন
২. তেলের দাম বৃদ্ধি: খাদ্যেরও দাম বাড়াবে
৩. পাঠাগার এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা
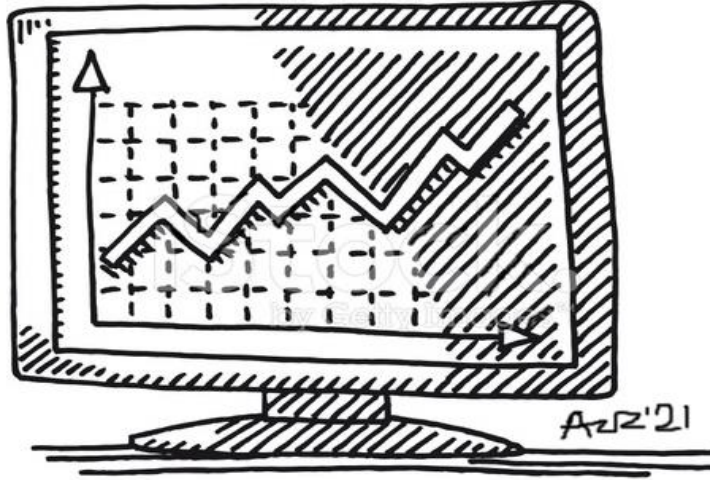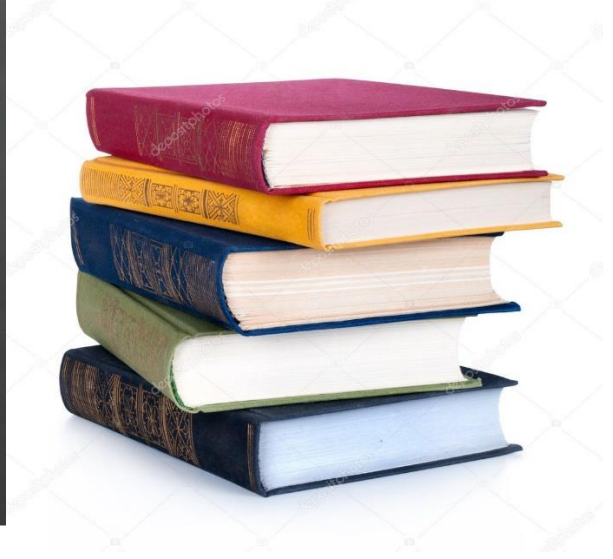
শেয়ারবাজারে দরপতন

বাংলাদেশে এখন সব থেকে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি 'প্রতিদিন শেয়ারের দর পতন'। ফলে বিক্ষুব্ধ বিনিয়োগকারীরা, বিচলিত বিশ্লেষকরা এবং কিছুটা হলেও চিন্তিত বর্তমান সরকার। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের ভাগ্য, জাতীয় অর্থনীতি, তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা এমনকি বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তাও। সবার জানা, বাজারের দরপতন শুরু হয় ২০১০ সালের শেষের দিকে এবং আমাদের স্টক মার্কেট এই প্রথম আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা করে নেয়। বিবিসি এবং ওয়াসিংটন পোস্ট জানুয়ারীর ১০ তারিখের অলৌকিক দরপতন নিয়ে বড় খবর ছেপেছিল। বিবিসির শিরোনাম ছিল, Bangladesh stock market fall : Clashes hit Dhaka. সংবাদের বিশ্লেষণে বলা হয়, স্টক মার্কেটের ইতিহাসে এটি সব থেকে বড় দরপতন। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি উর্ধ্বমুখী, মাথাপিছু আয় ৭০০ ডলারের মতো অথচ স্টক মার্কেটের অব্যাহত পতন একেবারেই বিশ্লেষণযোগ্য নয়। অর্থনীতি ইতিবাচক অথচ স্টক মার্কেটে ধস ব্যাপারটা বড্ড খাপছাড়া।

ওয়াসিংটন পোস্ট, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তে একজন বিনিয়োগকারী টিকলু কান্তি দাসের উদ্ধৃতি দিয়েছে; যেখানে সে বলেছে, 'আমি প্রতিদিন সকালে মার্কেটে আসি স্বপ্ন নিয়ে বাজার ভালো হবে, কিন্তু বাজার প্রতিদিনই নেমে যাচ্ছে অথচ সরকার কিছুই করছে না'। এ হতাশা কেবল টিকলু দাসের নয়; লাখো বিনিয়োগকারীরও। বিশ্লেষণে ওয়াসিংটন পোস্ট আরো লিখেছে, অর্থনীতি যখন সামনে এগুচ্ছে তখন সাধারণ মানুষ দরিদ্র হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যক্তিদের অভিমত হলো, 'নতুন বিনিয়োগকারীদের জ্ঞানের অভাবই এর মুল কারণ'।

কিন্তু এ সপ্তাহের অবস্থা আরো খারাপ। গত রোববার প্রধানমন্ত্রী যখন দুবাই থেকে আমেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন তখন ঢাকার রাজপথে মিছিল; জনগণ চাচ্ছে অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ। কারণ সপ্তাহের প্রথম দিনই বাজার একেবারে হতাশাজনক। টিকলু দাস নয়, তারই মতো এক ছোট ভাই আমাকে জানালো, মোবাইলের টাকাও তার কাছে নেই। একজন শিক্ষিত যুবক, যাকে রাষ্ট্র কাজ দিতে ব্যর্থ, সমাজে মাথা উচু করে বাঁচার সব সুযোগ থেকে যখন বঞ্চিত; তখন সে যদি স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করে এবং বাবা-মা, ভাই-বোনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়; সেটা কি সরকার বা রাষ্ট্রের সফলতা নয়? কিন্তু সে যদি এ ন্যূনতম সুযোগটুকুও কি রাষ্ট্রের কাছ থেকে না পায়? তার দায়ভার কার? তাদের দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল- এসব কি স্পর্শ করছে সেসব আমলাদের,

যারা এর নিয়ামক। কারণ এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শেয়ার মার্কেট তার স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে নেই। লেনদেন না হলেও গত সপ্তাহে সূচক বাড়তে দেখা গেছে। অর্থাৎ কারসাজি চলছে। খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ কর্তৃক করা তদন্ত রিপোর্ট জনগণের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল, তাহলে জানা যেত নাটের গুরু কারা? আজকাল জনগণের মধ্যে এ ধরণের বিশ্বাস যে, আওয়ামী লীগ সরকার যখন দায়িত্বে থাকে তখন শেয়ার মার্কেটে ধস নামে; অন্তত ইতিহাস তাই বলে। ১৯৯৬ সালের ঘটনা কেউ ভুলেনি। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক।

এমনিতে সরকার পদ্মা সেতু বিষয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাম্প্রতিক মন্তব্যে যথেষ্ট বিব্রত। যোগাযোগমন্ত্রীর কেচ্ছাও সবার জানা। এখন যদি প্রতিদিনই মানুষের স্বপ্ন ভাঙ্গে, মূলধন নষ্ট হয়, তাহলে তা পরিবারে সৃষ্টি করবে অশান্তি, সৃষ্টি করবে সমাজে বিশৃংখলার। সরকার যে আরো বিব্রতকর অবস্থায় পড়বে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা মনে করি, আমলাদের কানে জনগণের যে আর্তি পৌছায় না; রাজনীতিবিদদের কানে সে আর্তি পৌছবে এবং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে শেয়ার মার্কেট তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায় এবং অবশ্যই অতি দ্রুত।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি শেয়ার মার্কেট নিয়ে যে তত্ত্বই দিক তা যদি মানুষের কল্যাণে না আসে তাহলে সে তত্ত্বের এ দেশে প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এখন কল্যাণ অর্থনীতির যুগ। নিয়মনীতি এমন করা প্রয়োজন, যা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করবে, মানব কল্যাণকে করবে নিশ্চিত। ভুলে গেলে চলবে না, বিশ্বের সর্বাধিক জনঘনত্বের দেশ এটি এবং পৃথিবীর যে সব দেশে, বিশাল যুবসংখ্যা নিয়ত মুল স্রোতধারায় এসে মিলছে; বাংলাদেশ তার একটি। অন্তত জনমিতিক কাঠামো তাই বলে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজ দেয়া যে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তাও পরীক্ষিত। আর তাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকারকে দাতাদের কাছে 'সাহায্য' নিতে ধরনা দিতে হয়; গিলতে হয় লজ্জাজনক শর্ত। তখন আমাদের এতটুকু শরম করে না। অথচ দেশের মধ্যে এমন বাজার তৈরি করলে কি ক্ষতি যেখানে বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সম্ভব যা জাতিকে দেখাবে আশার আলো, নিশ্চিত হবে ভবিষ্যৎ এবং শেয়ারবাজার হতে পারে এমন একটি খাত, যা হবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য এবং সরকারও সেখানে থেকে প্রয়োজনে সংগ্রহ করতে পারবে অর্থ। কেবল প্রয়োজন, জনমুখী মানসিকতা।

[দৈনিক ডেসটিনি, তারিখ: ২০/০৯/২০১১ইং]

তেলের দাম বৃদ্ধিঃ খাদ্যেরও দাম বাড়াবে

কিছু কিছু বিষয় আছে যা বুঝার জন্য খুব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সহজেই বুঝা যায়। এমনিতেই ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য, কাঁচাবাজার সামগ্রী, মাছের দাম এমনি আকাশছোঁয়া, যা জনগণের ক্ষমতার প্রায় বাইরে। মসলার কথা আর নাইবা বললাম। তার উপর আছে বাজার সিন্ডিকেট; কোন সরকারই এই দৈত্যকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। সম্ভবত পৃথিবীতে আমাদেরই একমাত্র বাজার, যেখানে অর্থনীতির ব্যাসিক থিওরি কোন কাজ করে না। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হলে দাম কমবে কিংবা দাম স্থিতিশীল থাকবে। অথবা দাম বৃদ্ধি পেলে সরবরাহ বাড়িয়ে দাম নিয়ন্ত্রণ করবে। বাংলাদেশের বাজারে কোন খরিদ্দার যদি নাও আসে তবুও পণ্যের দাম কমে না । মূল কারণ, বাজার সিন্ডিকেট। এর জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীর নাকানি-চুবানি হয়নি; যদি, আমার মতে, তার প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি ছিল না। সার্বিক ফলাফলে বলা হয়েছিল, সাধারন জনগনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিশেষত আহার সামগ্রীতে প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়েছে, যা তার মৌলিক অধিকার। এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এর ফলে পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার আর একটা অর্থ রোগবালাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জনগণের চিকিৎসা ব্যয়ও কিছুটা হলেও বেড়েছে, যা তার পকেট এ থাকা টাকার পরিমাণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর আর একটা সমীকরণ, সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ব্যাংকে, যেহেতু টাকার ঘাটতি তাই সঞ্চয় কমেছে। অর্থাৎ বিষয়টি অর্থনীতির গণ্ডি পেরিয়ে সমাজনীতির মধ্যে এসে পড়েছে, যা সরাসরি ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে নানান হিসাব-নিকাশ তৈরি করেছে। বিষয়টা অনেকটা শয়তানের বাঁশের গায়ে গুড় লাগানোর সেই গল্পের মতো। তার পরের কাহিনী আমাদের সবার জানা।

গত দুদিন জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি বেশ আলোচিত ব্যাপার। বিভিন্ন কাগজে দেখলাম, কতটা বাস ভাড়া বাড়বে সেটাই মুখ্য হিসাব। বাস ভাড়া বেড়েছে। অর্থাৎ জনগণের পকেট থেকে আরও টাকা বেরিয়ে যাবে। বলা হয়েছে, গত দশ বছরে দশ বার তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কত গুণ বেড়েছে জনগণের আয়? আমরা নগরবাসী আমাদের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত। কিন্তু গ্রামের মানুষের জীবনে কি প্রভাব পড়বে এর? যারা চাকরি করে না কেবলই কৃষির উপর নিভরশীল, তারা খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারবে তো? শহরের মানুষের টাইম স্কেল হবে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য। কিন্তু গ্রামের দিনমজুর, আইলা বিধ্বস্ত সাতক্ষীরার সেসব মানুষ যারা এখনো খোলা আকাশের নিচে বাঁধের উপর বাস করছে কিংবা বাগেরহাটের সেসব কৃষক যাদের সব কৃষি ক্ষেত এখন জোয়ারের পানিতে ডুবে আছে তাদের কি হবে? ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৫ টাকা বেড়েছে।

তার কারণে ধান উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কৃষক কিভাবে বাড়তি খরচ জোগান দেবে? নিশ্চিত, খুব শিগগিরই চালের দাম বাড়বে।

বিষয়টি জানার জন্য লেখা শুরু করার আগে আমার বাল্যবন্ধু ইজাজ, যে গ্রামে থাকে; শিক্ষিত, চাকুওে এবং সচ্ছল কৃষক তাকে বলেছিলাম ডিজেলের দাম বৃদ্ধিও ফলে ধান উৎপাদন খরচ কতটা বাড়বে হিসাব দিতে। যা জানা গেল তা হলো, একবিঘা (৩৩ শতাংশ) ইরি ধান উৎপাদনে ৫০ লিটার ডিজেল দরকার পড়ে। প্রতি লিটার যদি ৫ টাকা হাওে দাম বাড়ে তাহলে অতিরিক্ত ২৫০ টাকা খরচ বৃদ্ধি পাবে। তার উপর ৫০০ টাকা দামের একবস্তা ইউরিয়া এখন ১০০০ টাকা দাম (অন্যান্য ব্যয় যেমন মজুরি, কীটনাশক, সেচপাম্প ইত্যাদি বৃদ্ধি ধরলাম না)। অথচ একবিঘায় ধান উৎপাদন হয় নিট ২০ মণ। আর একমণ ধান থেকে সর্বোচ্চ ২৭ কেজি চাল হয়। এবং এই অতিরিক্ত ২১৫০ টাকা ২৭ কেজি চালের ওপর ৯ টাকার ওপর যোগ করে।এটা থেকে জানা যায়, শুধু ডিজেল লিটারপ্রতি ৫ টাকা বৃদ্ধিও জন্য চালের দাম কেজিপ্রতি বৃদ্ধি পাবে ৯ টাকা। এ হিসাবে বুঝা যাচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে চালের আর এক দফা দামের উল্লম্ফন নিশ্চিত। প্রশ্ন হলো, কৃষককে কে জোগাবে এই বাড়তি খরচ? একজন সাধারন মানুষ কে ভর্তুকি কি জানে না, আইএমএফ কি বোঝে না, অর্থমন্ত্রীর নানান তাত্বিক হিসাব তার কাছে গৌণ; তার চাই দুমুঠো ভাতের নিশ্চিয়তা। আর এই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে তার খাদ্যের অধিকার কি আর একটু সংকুচিত হলো না? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা সঠিক পথে এগুচ্ছি তো? নাকি আইএমএফ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের শর্ত মানতে গিয়ে সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করছি। জনগণের আয় বাড়ছে না অথচ নিয়তই বাড়ছে ব্যয়। আর কত মানুষকে এভাবে ট্রাকে করে আটা চাল বিলিয়ে খাওয়াবে? কতদিন? তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অর্থমন্ত্রীর গ্রামীণ দরিদ্র, শহুওে বস্তিবাসী, চরের ছিন্নমূল, নদীভাঙনকবলিত, আইলা বিধ্বস্ত অসহায়দের কথা মনে ছিল কি? নইলে সেদিন দুরে নয়, যখন সবাই চিৎকার দিয়ে বলবে, 'ভাত দে শালা; নইলে এবার মানচিত্র খাব'।

[দৈনিক ডেসটিনি, তারিখ: ২৩/০৯/২০১১ইং]

পাঠাগার এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা

পাঠাগার এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা

‘কেউ যদি আমার মোমবাতির দীপ শিখা থেকে নিজের মোমবাতির দীপ জ্বালায়, তাতে যেমন আমার বাতির আলো কমেনা; তেমনি যে আমার কাছ থেকে ধারণা বা জ্ঞান পায়, সে তা গ্রহণ করলে আমার নিজের জ্ঞান ম্লান হয়না।’

.. টমাস জেফারসন
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম স্থপতি।

প্রাক্ কথা :

মানব ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার নিয়ে নানা উত্তর থাকতে পারে; তবে এ বিষয়ে সবায় একমত যে, ‘লিপি বা অক্ষর’ হচ্ছে মৌলিক আবিষ্কার যা মানুষকে অধিকতর মানুষ হতে সহায়তা করেছে। ‘শিক্ষা’ হচ্ছে তার বিকশিত রূপ যা নানাভাবে বর্তমান সভ্যতার জন্ম ও বিকাশে একক অবদান রেখেছে। ‘পশু জন্মালে পশু কিন্তু মানুষ তা নয়; তাকে মানুষ হতে হয়'। ‘মানুষ হওয়া একটা প্রক্রিয়া; বহমান ধারা’, যার শেষ নেই। কবে কোথায় কখন প্রথম বই লিখিত হয়েছিল কিংবা পৃথিবীর প্রথম লাইব্রেরী কোথায় স্থাপিত হয়েছিল(?) তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে এর প্রয়োজনীয়তা এক দিনে তৈরী হয়নি: সমাজ বিবর্তনের ধারায় তার বিকাশ। আমরা ভারতীয় সভ্যতার মানুষেরা বেশ অহংকারের সাথে বলতে পারি, বৈদিক আমল থেকেই এখানে জ্ঞান চর্চার শুরু; আর তা হয়েছিল খৃস্ট জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে। কেমন ছিল সে সভ্যতায় জ্ঞান চর্চা; গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন হতো; ‘তর্ক-বিতর্ক’ ছিল শিক্ষা-প্রদান প্রক্রিয়া (তখন ইউরোপের মানুষ বর্বর যুগে বাস করতো)। সমাজে মানুষ ছিল অতি মাত্রায় যৌক্তিক এবং সত্যাশ্রয়ী। সে বিকাশের-ই পরবর্তী ফসল, নালন্দা, পাহাড়পুর, কিংবা অজন্তা, ইলোরা। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই ইতিহাসও হয়তো আমাদের জানা নেই।

ভাবনার নেপথ্যে:

কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দু:খ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য-সমস্তই আকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।' যদিও এ মন্তব্য ভারতবর্ষ স্বাধীনতারও আগে তবে তার মৌলিকত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারন, কেবলমাত্র কতিপয় 'এ+ কিংবা সংখ্যাতত্ত্ব' দিয়ে শিক্ষিত মানুষের হিসাব করা বড় ভুল। এতে হয়তো সাক্ষরতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরী হচ্ছে যারা আপিসে কাজ করতে সক্ষম কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈরী হচ্ছে কিনা, তা আজকের বড় জিজ্ঞাসা। কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের নির্ধারিত ক'খানি বই পড়লেই হয়ত ভালো পাস দেওয়া যায়, এমনকি ভালো চাকরিও পাওয়া যায়; কিন্তু তাতে ভালো মানুষ তৈরী হয় কি? শিক্ষা যখন অর্থনৈতিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে হয়; তখন জ্ঞান হয় অধরা; আর জ্ঞানহীন শিক্ষা আসলেই বড় ভয়ানক। তা যেমন সমাজের জন্য ক্ষতিকর তেমনি রাষ্ট্রের জন্যও। সেজন্য প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা যা শ্রেণী কক্ষের নির্ধারিত ক'খানা বই পড়ে সম্ভব নয়। এলক্ষ্যে প্রয়োজন আরও অনেক বই পড়া যা নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর জ্ঞানকে করবে বিকশিত। একারনেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষ সাড়ে তিন হাত, তাই বলিয়া কেবলমাত্র সাড়ে তিন হাত জায়গা হইলেই তাহার চলেনা: প্রয়োজন হয় আরও অনেক বেশী জায়গার'। শি্ক্ষাও তেমনি। মনে রাখা জরুরী, কেবল শ্রেণীকক্ষ নয়; শিক্ষার মূল আধার হচ্ছে, পাঠাগার। ছেলেমেয়েরা যত বেশী পাঠাগারমুখী হবে, তারা হবে ততটাই যৌক্তিক এবং মুক্তমনের অধিকারী। প্রকৃত শিক্ষা তাই যা মানুষকে 'স্বপ্ন দেখাতে' সাহায্য করে। সেজন্য বর্তমানের মহান দার্শনিক এ.পি.জে. কালাম যথার্থই বলেছেন,'স্বপ্ন তা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখো; স্বপ্ন তাই, যা পূরণ করতে সারাজীবন কখনও ঘুমানো যায়না'। তার জন্য দরকার অধ্যয়ন এবং পরিশ্রম।

বর্তমানের জীবন 'বোকা বাক্সে বন্দী'; তার থেকেও ভয়ংকর হচ্ছে, 'জীবনখেকো মুঠোফোন (মোবাইল)'; এক গবেষণায় দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের দিনের এগারো ঘন্টা কেড়ে নেই এই মুঠোফোন; তাহলে তার জ্ঞান চর্চার কী হবে? গত শতাব্দীর আশ্চর্যরকম আবিষ্কার হচ্ছে 'মুঠোফোন, ইন্টারনেট এবং এ্যাপ্‌স'; যা মানুষকে হয়তো গতি দিয়েছে কিন্তু কেড়ে নিয়েছে তার মমত্ববোধ, বিচ্ছিন্ন করেছে তাকে পরিবার থেকে, এমনকি দূরের মানুষের প্রতি সে হয়েছে আসক্ত এবং অবহেলা করে চলেছে নিকটজনকে; কখনও কখনও নিজের পিতা-মাতাকেও। এই অতি-উন্নাসিকতা বর্তমান প্রজন্মকে করেছে শিক্ষালব্ধ-বিবেকহীন; তথাকথিত গ্লোবালাইজেশন, নতুন প্রজন্মকে নিজের দেশকে যত না ভালবাসতে শিখিয়েছে, তার থেকে তারা বেশী

আসক্ত হয়েছে, সাগরপাড়ের রঙিন দেশে বাস করার স্বপ্নে। এমনকি এটাকেই তারা মনে করে সব-থেকে বড় অর্জন। তাদের উদ্দেশ্যহীন এই পথচলা দেখে মনে পড়ে যায় গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের জীবনের একটি ঘটনা।

আলেকজান্ডারের জীবনিকার আরিয়ান থেকে বর্ণিত যে, একদল জৈন-সাধু আলেকজান্ডারকে বলেছিলেন, 'রাজা আলেকজান্ডার! প্রতিটি মানুষেরই অধিকারে ততটুকু ভূমিই থাকে যতটুকুর উপর সে দাড়িয়ে আছে। তুমিও আমাদেরই মত মানুষ ছাড়া কিছু নও। শুধু তফাত এই যে, তুমি সর্বক্ষনই ব্যস্ত, কিন্তু তোমার দ্বারা কোনও মংগল হয় না; ....কিন্তু তুমি নিজের কাছেও এক আপদ, অন্যদের কাছেও ...তুমি শীঘ্রই মারা যাবে, তখন তুমি ততটুকু জমিই পাবে যতটুকু তোমাকে সমাধীস্থ করার জন্য লাগবে (অমর্ত্য সেন, তর্কপ্রিয় ভারতীয়, আনন্দ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ২০০৭)।' অতি বস্তুবাদীরা এ তথ্যটুকু জানলে সমাজের উপকার হতো।

সুন্দরের আকাংক্ষায়:

১৭৭৮ সালে আমেরিকার সংবিধানের মূল স্থপতি টমাস জেফারসন এক চিঠিতে জর্জ ওয়াসিংটনকে লিখেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বদেশচিন্তা কখনোই সুরক্ষিত হতে পারে না, যতক্ষন পর্যন্ত না এ দেশ পরিচালনার ভার তাদের হাতেই পড়ছে, যারা শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন, সংকীর্ণতা বর্জন করেতে শিখেছেন, শিক্ষা ও অশিক্ষাকে মুক্তবিচারের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে প্রণোদিত হয়েছেন' (মোজাফফর আহমদ, অনার্জিত শিক্ষাপুরাণ-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩)। একথা আমাদের স্বাদেশিকতার জন্যও প্রযোজ্য। একটি সুন্দর জাতিগঠনের পূর্ব শর্তগুলির একটি হচ্ছে শিক্ষা; তবে মনে রাখতে হবে, কোনভাবেই নৈতিকতাহীন শিক্ষা নয়। অর্থাৎ শিক্ষা হতে হবে আলোকিত, যুক্তিপূর্ণ এবং মানব কল্যণমুখী; তা নাহলে হয়তো নিকট ভবিষ্যতে আবার একদিন 'বর্তমান শিক্ষাকে বর্জনের প্রশ্ন উঠলে আশ্চর্যান্বিত হবো না'; হয়তো অন্য কোন নতুন শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে।

বর্তমানের সবকিছুই উন্নয়ন মুখী; শিক্ষাও তা থেকে বাদ যায়নি। কিন্তু মুসকিল হলো, উন্নয়ন কী (?) তা গোলমেলে হয়ে গেছে আমাদের চিন্তায় এবং মননে। এটা না ঝুঝে দৌড় দেবার মতো। প্রকৃতটা জানলে, সমাজ দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। উন্নয়ন বলতে অমর্ত্য সেনের মতে, 'শেষ বিচারে মানুষ যে ধরণের জীবনযাত্রাকে যথার্থ মূল্য দেয়, তেমন জীবনযাপনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার প্রসারই হল প্রকৃত উন্নয়ন (সেন:

ভারতঃ উন্নয়ন ও বঞ্চনা; আনন্দ পাবলিসাস,কলকাতা, ২০১৩)।' আর এর মধ্যে রয়েছে, প্রকৃত ইঙ্গিত, শিক্ষাকে হতে হবে স্বাধীনতামুখী; একই সাথে সেই শিক্ষার থাকতে হবে মানুষের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষমতা। আমাদের নতুন প্রজন্ম তা পারবে কি?

একটি জাতিকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যেমন শিক্ষাহীনতা দায়ী, তেমনি কখনও চলমান শিক্ষা ব্যবস্থাও দায়ী হতে পারে যদি তার ভেতর না থাকে স্বাদেশিক চিন্তা এবং ইতিহাসপ্রীতি। বর্তমানে আমরা অতি মাত্রায় পশ্চিমা-সভ্যতার অনুসারী; তাদের সবকিছুই ভালো, নিজেদের কোন কিছুই ভালো নয় (নিজের দেশকে চুড়ান্তভাবে অপমান করা); আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একে বলা হয় 'জেনোসেনট্রিজম'। এমনকি আমাদের কোন অর্জনই নেই যা গর্ব করার মতো (!!)। কিন্তু আমরা জানিনা, পুরো ইউরোপ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো তখন ভারতে গৌতম বুদ্ধ যুক্তি ও তর্কের ভিত্তিতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এমনকি 'গণতন্ত্র' তার সময়েই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল (এথেন্সের প্রায় দু'শ বছর পূর্বে)। অনেকে জানেনা, গৌতম বুদ্ধের 'সংঘ-ধারণার' উপর ভিত্তি করেই আজকের জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই যে নিজের ইতিহাসকে না-জানা, তা দিয়ে একটি জাতিকে শাসন করা সম্ভব। বিষয়টি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে ১৮০১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্প্যানির এক কর্মকর্তা জর্জ লিন্ডসে জোন্স্টোন বলেছিলেন,...'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হল একটি অভিমতের সাম্রাজ্য, এবং নেটিভদের (ভারতীয়দের) নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনার অভাবের উপর ভিত্তি করে এই সাম্রাজ্য দাড়িয়ে আছে (সেন, ২০১৩)।' একবার ভাবুন, 'নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনার অভাবের উপর ভিত্তি করে' কথাটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ; নিজের শক্তি সম্মন্ধে না জানার জন্য বৃটিশরা দু'শো বছর আমাদের শাসন করেছিল। এজন্যই সক্রেটিস বলেছিলেন,'নিজেকে জানো' যা আসলে স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে পড়তে পারার ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আরও বলেছিলেন, '...যত বেশী জ্ঞান অর্জন করবে, ভালো আর মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা তত বেশী বৃদ্ধি পাবে।' এই যে নিজেকে জানা, ভালো আর মন্দের পার্থক্য করা; তা কখনও সিলেবাস্ পড়ে হয় না। এ কারনেই ইরাণের মহান কবি ফেরদৌসি, তার জাতির ঘুম ভাঙিয়েছিলেন 'শাহনামা' নামক কাব্য রচনার মাধ্যমে। আজ আমাদের বড় প্রয়োজন, অতীত জানা; যার উপর আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত দুই দাড়িয়ে আছে। আর তা সম্ভব কেবল মাত্র বই পড়া বা অধ্যয়নের মাধ্যমে; আরও সহজ করে বললে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে।

নতুন পাঠাগার: স্বপ্নের অভিসারে

এখানেই মুল প্রশ্ন, 'জানবার বা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটি' কী হবে? কেবল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কি তার একমাত্র উপায় (এ্যাপ্রোচ) ? নাকি অন্যান্য অনানুষ্ঠিক পদক্ষেপও এর জন্য সমাধান হতে পারে। জাতীয়

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্যার বলেছিলেন, কোন সমাজকে বুঝতে হলে দুটো জিনিস দেখা দরকার। প্রথমত: সেখানকার কাচা বাজারে কী বিক্রি হচ্ছে দেখা আর লাইব্রেরীতে কি ধরণের বই আছে তা পর্যবেক্ষণ করা। তাহলে ওই সমাজ সম্পর্কে জানা যাবে। কিন্তু যে সমাজে বই পড়া প্রায় শুন্যের কোঠায়; সেখানে কিইবা দেখার আছে। বলতে লজ্জা নেই, বর্তমান প্রজন্ম একেবারে বই বিমুখ; তারা বই-পড়া বলতে কেবলমাত্র সিলেবাসভিত্তিক কতিপয় বই পড়াকে বোঝে; যা তাকে তথাকথিত 'ভালো ছাত্র' করে তুলবে। বাঙালীর বই বিমুখীনতা আজকের নয়; তারও শুরু গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে যা সৈয়দ মুজতবা আলী শ্লেষাত্মক ভংগিতে প্রকাশ করেছিলেন; 'বাঙালীর বই কেনা ? মরার ভয়ে সে বই পড়াই ছেড়ে দিয়েছে !'

তরুন প্রজন্মেও কাউকে হয়তো শরৎচন্দ্র বা সমরেশ মজুমদারের কথা বললে হা করে তাকিয়ে থাকে। এক মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে একজন বাংলায় পাশ করা ছাত্রকে আমি, জীবনানন্দ দাশের যেকোন একটা কবিতা বলতে বলেছিলাম। সে এমনভাবে মাথা নীচু করে থাকলো, তাতে বোঝা গেলো সে এই প্রথম জীবনানন্দের নাম শুনেছে। অথচ ছেলেটি বাংলায় অনার্স ও মাস্টার্স পাশ; সে ডিগ্রীধারি কিন্তু শিক্ষিত কি? তাই বলছিলাম, বই পাঠের অভ্যাস দরকার, তা হতে পারে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমন্বিতভাবে। বর্তমান প্রয়াস তার একটা পদক্ষেপ কিংবা বলা যায় শুভ সূচনা।

একটি ভালো কাজ যেকোন স্থান থেকেই শুরু হতে পারে; পাঠাগারের পথ চলাও তেমনি। দৃশ্যতঃ এ যেন উল্টো স্রোতে গা ভাসানো: অনেকটা এমন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে'। যখন সবায় অর্থের পিছনে ছুটছে; তখন কোন ব্যাক্তি বা কিছু ব্যক্তিবর্গ নিজের বা নিজেদের অর্থে একটা পাঠাগার তৈরী করছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, সবকিছু থেমে গেলে কেউ না কেউ আলো জ্বালে। 'পাঠাগার'ও তেমনি; প্রত্যাশা পাঠাগার আলো ছড়াবে এবং আলোকিত মানুষ তৈরীতে সহায়তা করবে। পাঠাগারের শিখা অসংখ্য শিখার জন্ম দেবে; কারণ জ্ঞান কখনও কমেনা; বরং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশঃ এবং ক্রমশঃ। এটা সত্য, পাঠাগারের প্রভাব চোখে পড়ে না, কিন্তু দীর্ঘদিনের পথ পরিক্রমায়, যে সকল পড়ুয়ারা এই পাঠাগারের সাথে

সম্পৃক্ত থাকবে তারা হবে যুক্তিমনা এবং মুক্তমনের মানুষ। এবং অতি অবশ্যই তারা আলো ছড়াবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; অবদান রাখবে জাতি গঠনে।

শেষ কথা:

কাউন্ট লিও টলস্টয়কে সমগ্র মানব সমাজের জন্য পরামর্শ দিতে বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'রিড, রিড এন্ড রিড' (অধ্যয়ন করো, অধ্যয়ন করো এবং অধ্যয়ন করো)। প্রকৃত অর্থেই মনের আঁধার দূর করতে হলে বই পড়ার অভ্যাসের কোন বিকল্প নেই। অবশ্যই পাঠাগারের দীপ্তিময় আলোতে আঁধার কেটে যাবে এবং সুন্দর সকালের সন্ধান মিলবে। শেষ করবো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চরন দিয়ে,

'আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে;
তোমার ছেলে জাগলে পরে, রাত পোহাবে তবে।'

প্রত্যাশা, পাঠাগার সংখ্যাতীত ছেলেমেয়েদের রাতের আঁধার পেরিয়ে সুন্দর সকাল উপহার দেবে।

....

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. অমর্ত্য সেন, তর্কপ্রিয় ভারতীয়, আনন্দ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ২০০৭

২. অমর্ত্য সেন, ভারত: উন্নয়ন ও বঞ্চনা; আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০১৩

৩. মোজাফফর আহমদ, অনার্জিত শিক্ষাপুরাণ-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩

৪. সৈয়দ মুজতবা আলী, বই কেনা (পঞ্চতন্ত্র), আনন্দ পাবলিসার্স, কলিকাতা

৫. এ.পি.জে.কালাম, মাই জার্নি: ট্রান্সফর্মিং ড্রিমস ইন্টু এ্যাকশান, রূপা, ২০১৫

৬. কাজী নজরুল ইসলাম, সকাল বেলার পাখী (কবিতা)

৭. রিয়াজ হাসান, ‘লাইফ এজ এ উইপোন’, রাউটলেজ, ২০১১

৮. Sanjay Kathuria (ed.), A Glass Half Full: The Promise of Regional Trade in South Asia, World Bank, 2018

৯. Emile Durkheim, Suicide: A Study in Sociology, 1897

১০. Aminur Rahman, Suicide: Causes Identification and Prevention Thought (Bangla), Arial, 2014

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাঃ আমিনুর রহমান বর্তমানে পেশায় একজন 'উন্নয়ন গবেষক'। সমাজবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স; পি.এইচ.ডি করেছেন 'বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন' নিয়ে। পেশা জীবন শুরু কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে; পরবতীর্তেতে শিক্ষকতা করেছেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে, পড়িয়েছেন সমাজবিজ্ঞান, গবেষণা পদ্ধতি এবং উন্নয়ন সমস্যা। বিগত দেড় দশকেরও বেশী সময় ধরে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেছেন, উন্নয়ন-সমাজবিজ্ঞানী, সিনিয়ির রিসার্চার, জেন্ডার স্পেসালিস্ট, টিম লিডার, কন্সালটেন্ট্ হিসাবে। এছাড়া ড. রহমান, জ্যেষ্ঠ গবেষক হিসাবে এ পর্যন্ত একশ'র বেশী গবেষণা-প্রকল্পে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি 'সাউথ এসিয়ান স্টাডিজ সেন্টার' নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে 'সিনিয়র রিসার্চ ফেলো' হিসাবে কর্মরত এবং পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি-তে সিনিয়র গবেষক ও এ্যাকাডেমিক ফ্যাকাল্টি হিসাবে কর্মরত।

ড. আমিনুর রহমান তার পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসাবে যেমন লিখেছেন গবেষণা রিপোর্ট; তেমনি এ পর্যন্ত দেশী ও আন্তর্জাতিক জার্ণালে তার প্রকাশিত 'গবেষণা নিবন্ধের' সংখ্যা পঁচিশ। এছাড়া এপর্যন্ত তার দুটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'আত্মহত্যাঃ কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধ ভাবনা' (২০১৪, আরিয়াল, ঢাকা) এবং 'এমপাওয়ার্মেন্ট অব উইমেনঃ আন্টোল্ড স্টোরি অব বাংলাদেশ (ইংরেজী; ২০১৬ ল্যামবার্ট, জার্মানী)'। তার প্রকাশিতব্য গবেষণা বই 'ওয়াটার ডিস্পুট বিটুইন্ বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়াঃ রি-থিংকিং দ্য ইস্যুজ' এবং 'বাংলাদেশের গ্রামঃ রূপান্তরের গল্প' যা ২০২২ সালে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় কলাম লেখক হিসাবে লিখেছেন। এর বাইরে তিনি দুটি গবেষণা জার্ণালের এডিটরিয়াল বোর্ডের সদস্য হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ড. রহমানের গবেষণার বিষয়, দরিদ্রতা ও উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব বিকাশ ও সক্ষমতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার (সার্কের) সমস্যা ও সম্ভাবনা। এ পর্যন্ত ড. রহমান একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে 'রিসোর্স পার্সন' হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেছেন।